‘দ্য লায়ারস টেল’[১]
ধর্ষণ মামলার বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাক্ষী ও সাক্ষ্যর বাস্তবতা

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা

নারীবাদী ভাবনাচিন্তা আমাদের এই বিষয়ে অবগত করে যে সংবেদনশীল বিষয়ে গবেষণাকাজ করতে গেলে সেটি স্বয়ং গবেষককেও প্রভাবিত করতে পারে (Moran-Ellis, 1996; শুভ্রা, ২০১০)। ধর্ষণ, নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে গবেষণাকাজ করবার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলাটা জরুরি যে, এক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে কেউই এটিকে নিজের জীবনের বাইরের কোনো প্রপঞ্চ হিসেবে দেখতে পারেন না– তা তিনি গবেষক, গবেষিত, ফিল্ড অ্যাকটিভিস্ট, আইনি পন্থায় বিচারালয়ে-সালিশের উঠানে কিংবা চিকিৎসকের জ্ঞানে বহুধা পন্থায় এর মোকাবেলা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তি, যেই হোন না কেন। সে সূত্রে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে কর্মরত একজন কর্মী আমাকে বলছিলেন, “আমার পুত্রসন্তান যদি ‘ধর্ষক’ হয়, মা হিসেবে আমার জন্য সেটি বোধহয় অনেক বেশি সহজে হজম করা সম্ভব; আমি তাকে ধরে নিয়ে জেলে দিয়ে দেব। এই যে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে ছোট ছেলেমেয়েরা আসে, বীভৎস শারীরিক কষ্ট নিয়ে– তাদের আমি যখন ডিল করি এটা আমি মা হিসেবে মনে হয় মেনে নিতে পারব না।”

ধর্ষণ মামলার সাক্ষ্য ও সাক্ষীর বাস্তবতা প্রসঙ্গে আমার আজকের এই লেখাটা একজন অ্যাকটিভিস্ট নারীর জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করতে চাই। তাঁর সাথে গবেষণাসূত্রে আমার পরিচয়ের বয়স ৮ বছর হবে। তিনি গবেষণার মূল তথ্যদাতা (key informants) হিসেবে কাজ করছিলেন। নিজের মাঠে কাজ করবার অভিজ্ঞতা হিসেবে টাঙ্গাইলের একটি ধর্ষণ মামলার বিস্তারিত ঘটনাপ্রবাহ সহভাগ করছিলেন। ২০০৭ সালে শ্বশুরবাড়িতে বসবাসরত অবস্থায় দেবরের ছোড়া দাহ্যপদার্থে প্রবাসী বড় ভাইয়ের বিবাহিত স্ত্রীর শরীর ঝলসে যায়। ঝলসে যাওয়া শরীরসমেত তাকে ৭ দিন ঘরে লেপ দিয়ে মুড়িয়ে আটকে রাখে দেবর ও তার শ্বশুরবাড়ির মানুষজন। পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় সেই অ্যাকটিভিস্ট এনজিওকর্মী ওই নারীকে উদ্ধার করে ওসিসিতে নিয়ে যান। চিকিৎসা করে দেখা যায়, তার শরীর অ্যাসিডে ঝলসে গেছে এবং হাড়ে পচন ধরেছে। ধর্ষণের চেষ্টা ও দাহ্যপদার্থ দিয়ে শরীর পুড়িয়ে দেওয়ার মামলা দায়ের করা হয়[২]। সে সময় ভিকটিমের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ ছিল না। তার স্বামী প্রবাসী, পিতামাতা দরিদ্র; ওই

---

[১] ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে আমি যখন ১৫ দিন আগে ধর্ষণের সার্ভাইভার কিশোরীর সাথে কথা বলছি, তিনি হঠাৎ বলছেন, *আপনি আমার মেডিকেল রিপোর্ট দেখেছেন? আমার মা আমার জন্মসনদ দেখিয়ে বারবার বলছেন আমার বয়স ১৪; কিন্তু সেটি বাড়িয়ে মেডিকেল সনদে ১৫ থেকে ১৬ করে দিয়েছে। আমার সংগ্রামী শিক্ষিত মা এখন যে কোথাও কোনো প্রমাণ পাচ্ছেন না। তিনিও কিন্তু প্রথম আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। ধর্ষণের, পুরুষলোকের সুবিধাই হলো তারা জানে আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ইউ আর টেলিং দ্য লায়ারস টেইল!* পারিবারিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় নিপীড়নের ভিকটিম হওয়া মধ্যবিত্ত নারীর ওই বক্তব্যটি ধর্ষণ মামলার সাক্ষ্য, সাক্ষী নিয়ে সামাজিক ভাবনার বহুল প্রচলিত ভাবনা মোকাবেলায় গবেষক হিসেবে আমার পথ প্রশস্ত করে। এই কারণে গবেষিতের উক্তি সরাসরি এই প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হলো। তিনি বলছিলেন, *আমি অনেক গল্প পড়ি, রূপকথাও। রূপকথা কোথাও আমাদেরকে বাস্তবতার এমন বাজে দিকগুলো শেখায় না। শেখায় না বলে আমি যখন বাজে দিক দেখি, বলতে চাই– প্রথমেই বলে তুমি মিথ্যা বলছো, মিথ্যা বলছো।*

[২] টাঙ্গাইলে ২০০৭ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩) ৯(৪) (ক)/৪(২)(ক) ধারায় ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণের চেষ্টা করায় ব্যর্থ হয়ে তরল দাহ্যপদার্থ দিয়ে পেট, পিঠ, স্তন ও বুক বিকৃত করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার অপরাধে দেবরকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। কেস রেফারেন্স নাঃশি-৩৩৯/০৭)।

এনজিওকর্মীই পাশে এসে দাঁড়ান। বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা নিয়ে তার ৭ বারের অধিক অপারেশন করা হয়। এই অবস্থায় মামলা চলতে থাকে। স্থানীয় প্রভাবশালীরা ওই এনজিওকর্মীকে মেরে ফেলারও হুমকি দেয়। শেষমেশ যখন কিনা বাদী অর্থাৎ ভিকটিমপক্ষীয় সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়, সেসময় এনজিওকর্মীর বাড়ির সামনে থেকে তার ক্লাস নাইনে পড়ুয়া পুত্রসন্তানকে আসামিপক্ষ অপহরণ করে নিয়ে যায়। মোবাইলে তাকে জানানো হয় যে তার সন্তানকে ছেড়ে দেওয়া হবে, যদি তিনি এই মামলায় সাক্ষ্য না দেন। ২১ দিন অপহৃত ছেলেসন্তান আটক থাকে। মামলায় সাক্ষ্য দিতে অপারগ হন এনজিওকর্মী। তার সাথে চিকিৎসক এবং পুলিশও। এই সময়ের মধ্যেই বাদীর তখনকার স্বামী, সেই স্বামী যার ছোট ভাই নারীর শরীর ঝলসে দিয়েছে, প্রবাস থেকে এসে সাক্ষ্য দেন যে *তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে নানা পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। তার ছোট ভাইকেও কুপ্রস্তাব দিয়েছেন। ছোট ভাই রাজি না হওয়ায় এবং বিয়ে করতে যাওয়ায় তাকে শায়েস্তা করতে ভিকটিম নিজের শরীর ঝলসে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।* আমাকে এনজিওকর্মী বলছিলেন, আমি এরপর বহুবার বলেছি তুমি আবার মামলাটা তুলো। রাজি হয় নি। আমার সবসময় নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

গবেষক হিসেবে ঘটনার প্রায় ৫ বছর পরে আমি যখন নিজে এই সার্ভাইভার নারীর সাথে কথা বলতে যাই, উনি আমাকে বলছিলেন, *আমার সবসময় মনে হয়েছে আমি তো আসলে সংসার করতে চেয়েছিলাম। যার স্বামী এসে বলে যে শরীর স্ত্রী নিজে পুড়াইছে, দেওরের সাথে শুইতে চাইছে– আমার কথার তো কোনো মূল্য নাই! আমার মামলা করার তো কোনো মূল্য নাই! কেবল প্রতি গরমে আমার ঘাগুলো নতুন করে কাচা হয়ে যখন ক্ষত হয়ে যায়, আমার মনে হয় আমি ওসিসিতে গিয়ে পরীক্ষা করাই, আর ততবার আমি অ্যাসিড সন্ত্রাস আর ধর্ষণের মামলা করি, যৌন হয়রানির মামলা করি; কাচা ঘায়েও কি আদালতের প্রমাণ শেষ হয় না? আদালতরে জিগাই সমাজের মতো বিচার পাইতে হলে আমার শরীরেও কি পচন ধরন লাগবে...কেবল তখন মনে হয় কোর্টে দাঁড়ায়ে বলি আরো কতো প্রমাণ লাগবো!*

নারীর প্রতি নিপীড়ন তথা ধর্ষণ, ধর্ষণের আক্রমণ– বহুধাবিভক্ত বহুমাত্রিক নিপীড়নের ক্ষেত্রে নারীর শরীর স্বয়ং যদি সেই বীভৎসতা ধারণও করে থাকে, তাহলেও এই পুরুষালি বিচারসংস্কৃতি সেই নিপীড়ন ঘটনা ঘটার পেছনের কারণ কী কী হতে পারে তা জিজ্ঞেস করে। এই কারণ খোঁজা, নিপীড়নের কী-কেন খোঁজাই স্বয়ং পুরুষালি ভাবনার ফলাফল, যার মাধ্যমে নারীর নিপীড়ন অভিজ্ঞতা খারিজ করে দেওয়া হয়, অবমূল্যায়ন ও হাওয়া করে দেওয়া হয়। নারী তার শরীরে ধর্ষকের ডিএনএ নিয়ে সন্তান ধারণ করে ধর্ষকের বাচ্চা ধারণ করে 'ধর্ষণের এটমবোম' নিয়ে ঘুরছে কি না– এটা বিচারের বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রভাবশালী ভাবনায় বোঝার বিষয় ওই নারী কীভাবে, কোন পোশাকে কেন "ঐ সন্তান ধারণ করল?" সে সহজলভ্য ছিল কিনা! (শুভ্রা, ২০১৬)

২.

মামলার ঘটনাটি সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুরের। পুলিশ বলছে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আসামিকে আদালত কারাগারে পাঠিয়েছেন। মামলার বাদী বলছেন, ধর্ষণের কোনো ঘটনাই ঘটে নি। তিনি ধর্ষণের শিকার হন নি। তাই ডাক্তারি পরীক্ষাতেও নারী সম্মত হন নি। এই নারী বাদী হিসেবে আদালতে ৩ অক্টোবর ২০১৮ লিখিতভাবেও এ কথা জানিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ বলছে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। বিগত ৭ নভেম্বর ২০১৮-এর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সংবাদ মাধ্যমসুলভ আকর্ষণীয় শিরোনামের ধর্ষণ বিষয়ক সংবাদটি

এবার 'গায়েবি ধর্ষণ' মামলায় হয়রানি[৩]— আমার এক যুগেরও বেশি সময়ের নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক মাঠ গবেষণার অভিজ্ঞতাকে সচল করে তুলল।

২০০৪ থেকে নৃবিজ্ঞানে ধর্ষণ নিয়ে পড়াশুনা করছি, গবেষণা করছি। কাজ করতে গিয়ে 'মিথ্যা মামলা/ভাড়া করা মামলা'[৪]— এই প্রত্যয়গুলো মাঠে-ঘাটে ঘরে-বাইরে নানা সময়ে শুনে আসছি। ২০১১ সালে পত্রিকায় বহুল প্রচারিত ধর্ষণ মামলা ভিকির জজ কোর্টের বিচারিক শুনানির দিনগুলোতে সাজাপ্রাপ্ত আসামি পরিমল ও তার আইনজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল, ভিকির ছাত্রী লম্বায় পরিমলের চাইতে দীর্ঘ, শিক্ষার্থীটির মেডিকেল পরীক্ষায় সুস্পষ্ট ধর্ষণের কথা উল্লেখ নেই। ফলে পরিমল তার চাইতে আরো বড়সড় *খেলোয়ার টাইপের* ছাত্রীকে ধর্ষণ করে কীভাবে! পরিমল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বলে তাকে হয়রানি করবার জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলাটি মিথ্যা, ছাত্রীর সাথে পরিমলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল, ফলে এই কারণেও অভিযোগটি বানোয়াট[৫]। ২০১৩ সালে বিশেষভাবে নারীর প্রতি নিপীড়নসংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য আইনের বিষয়ে গবেষণাকাজ যখন শুরু করি, সে সময় *পুরো মামলাটাই মিছা*, *ঐ বেটি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া টাকা খাওয়াইয়া আমারে ফাসাইয়া দিছে*, *ভাড়াইট্টা মাইয়া ভাড়াইট্টা সাক্ষী আনছে* ইত্যাদি বিশেষণগুলো ধর্ষণ মামলা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়। ধর্ষণের, বিশেষত নারীর প্রতি বিভিন্ন মাত্রার নিপীড়নের মামলাগুলো মিথ্যা কিংবা বানোয়াট এই ভাবনা কিংবা মতাদর্শটি সাধারণ লোকচলতি কথার মধ্যে, চিন্তার মধ্যে বিরাজ করে[৬]। 'গায়েবি ধর্ষণ মামলা' নামে নতুন ধর্ষণ মামলার প্রত্যয়ন গবেষক হিসেবে আমাকে দারুণভাবে চমৎকৃত করল, আমার পিলে চমকে দিল এবং একইসাথে আমি ভীত হয়ে উঠলাম।

গায়েবি এই ধর্ষণ মামলার ঘটনার পরম্পরা[৭] বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধর্ষণ তথা নারীর প্রতি সহিংসতা বোঝাপড়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এই মামলার গ্রেপ্তার এড়াতে প্রায় এক মাস

---

[৩] দৈনিক প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০১৮।

[৪] *স্পষ্ট হতে দেখুন— শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০১৬, "সতীরই" কেবল ধর্ষণ হয় : সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(4) ধারার সামাজিক বাস্তবতা*, প্রকাশিত বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস (ব্লাস্ট) প্রকাশনী থেকে, ৬ জুন ২০১৬।

[৫] ভিকির নিপীড়নবিরোধী মঞ্চ থেকে ২০১১ সালে অভিযোগকারীর সাথে সামাজিক আন্দোলন তৈরি করবার একটি চেষ্টা বহাল রাখা হয়। সেই মঞ্চের একজন সদস্য ছিলাম আমি। অভিযোগকারী/বাদীর চার্জশিট থেকে এই বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। মেডিকেল সনদ বিষয়ে আরো পরিষ্কার হতে দেখতে পারেন— Suvra, Fatama Sultana, 2013, *Contested Dissent: Social Crisis Related to the Collection and Use of Medical Evidence in Rape Trials, in Ideas and Practices in Developement: Anthropologial Perspective, Department of Anthropology, Rajshahi University, Rajshahi.*

[৬] এই বিরাজ করাটা সামাজিকভাবে নিশ্চুপকরণের একটি কৌশল হিসেবে কাজ করে। আপনি যত বেশি নিপীড়নকে মিথ্যা কিংবা অসত্য হিসেবে নাকচ করে দিতে পারেন, ততই নারীর নিপীড়নের বাস্তবতা সমাজ থেকে নেই করে দেওয়া সম্ভব হবে।

[৭] পুলিশ বলছে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাতে বিশ্বম্ভরপুর থানায় হারুনুর রশিদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন উপজেলার ২৬ বছর বয়সী এক নারী। মামলার এজাহারে বলা হয়, রশিদ তাঁকে (বাদীকে) একটি সেলাই মেশিন দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ জন্য বাদী ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে গেলে চেয়ারম্যান তাঁকে কার্যালয়ের দোতলার একটি কক্ষে যেতে বলেন। পরে ওই কক্ষে গেলে চেয়ারম্যান তাঁকে ধর্ষণ করেন। ঘটনার সপ্তাহখানেক পর (৩ অক্টোবর ২০১৮) বিশ্বম্ভরপুর বিচারিক হাকিম আদালতে অভিযোগ আনয়নকারী নারী লিখিত আবেদন করেন। আদালতকে জানান, *তিনি ধর্ষণের শিকার হননি। এ রকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে এলাকার হাছান বশির*

এলাকাছাড়া ছিলেন বিবাদী হারুনুর রশীদ। সম্প্রতি উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়ে গত ৫ নভেম্বর ২০১৮ সুনামগঞ্জের আদালতে হাজির হলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। আদালতে হাজির হলে অভিযুক্তের আইনজীবী মামুনুর রশিদ জামিন প্রার্থনা করেন। তার পূর্বেই ৩ অক্টোবর মামলার অভিযোগকারী বিচারিক হাকিম আদালতে জানিয়েছেন তিনি ধর্ষণের শিকার হননি, এরকম কোনো ঘটনাই ঘটে নাই। বিবাদীর আইনজীবী জানান *যেখানে বাদী বলছেন তিনি ধর্ষণের শিকার হননি, সেখানে ধর্ষণ মামলা সচল থাকতে পারে না*। কিন্তু তারপরেও মামলা সচল আছে এবং বিষয়টি 'রাজনৈতিক'।

পত্রিকার পাতায় ছাপার অক্ষরে, গায়েবি ধর্ষণ মামলার বাদী, যিনি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে নাই মর্মে আদালতে আবেদন করেছেন– সেই নারীর বাস্তবতা, আবেগ ও *সত্য* কীভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, গণমাধ্যম, আদালত, আইনি সংস্কৃতি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে; নারীর প্রতি নিপীড়ন, ধর্ষণ যে কেবল লিঙ্গীয় নিপীড়নের মাত্রাতেই নেই, এর যে ডালপালা গজিয়ে বহুমাত্রিক রূপ বর্তমানে ধারণ করেছে– যেখানে নারীশরীর কেবল পুরুষালি এজেন্ট নয় বরং পুরুষালি প্রতিষ্ঠানগুলোর অপর পুরুষালি প্রতিষ্ঠানের সাথে/উপর ক্ষমতা চর্চার এক একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে– তার ধরনধারণ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগের জায়গা। ধর্ষণের ভিকটিম বলেছিলেন, *বিচারালয়, আদালত ভিকটিমের আবেগকে কোনো মূল্য দেয় না। এই আদালত আসলে যে ভিকটিম তাকে বিচারে রাখে, ভিকটিমকে প্রমাণ করতে হয় যে সে আসলে ধর্ষণের শিকার হয়েছে*। ধর্ষণের শিকার, ভিকটিম এবং সার্ভাইভার যে নারী হয়েছেন এবং এই নারীরা যারা তাদের নিপীড়নের অবমূল্যায়নকে খারিজ করবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন, নিপীড়ন বাস্তবতা প্রমাণের দায় হাতে নেন, তাদের জীবন পুনর্গঠনের লড়াই ও রাজনৈতিক যুক্ততার লেখনী– এই প্রবন্ধ।

৩

ধর্ষণ একটি বিদীর্ণ মুহূর্ত, যে সময় থেকে একজন নিপীড়িত তার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত ও বাস্তবতাকে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখতে পান এবং তিনি ধর্ষণপরবর্তী সময় থেকে তার জীবনের সকল সম্পর্ক ও যোগাযোগকে ওই একটি ধর্ষণ ঘটনার মধ্য দিয়ে বারবার পুনর্গঠিত হতে দেখেন। এই গঠন একটি সামাজিক বাছাইয়ের অংশ মাত্র (শুভ্রা ২০০৯); আর তাতে 'একটা গোটা মানুষ আর মানুষ থাকে না, শুধুই যৌনাঙ্গ। অপমানের বোধটার মধ্যে শ্রেণী, সামাজিক ইতিহাস, পরিপার্শ্ব ধরে ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু ছোট হয়ে যাওয়ার সামাজিক অনুভূতিটা এক, সেটা মেনে নেয়া বা না নেয়া বা আপত্তি করা বা না করার উপর নির্ভর করে না' (চক্রবর্তী ২০০৪; সুলতানা ও ইসলাম ২০১১)। 'ধর্ষণ ভয় প্রদর্শনের সেই সচেতন প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজের সকল পুরুষ সমাজের সকল নারীকে একরকম ভয়ের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করেন' (সুজান ব্রাউনমিলার ১৯৭৬)।

নামের এক ব্যক্তি তাঁকে বাড়ি থেকে খবর দিয়ে নিয়ে যান। একটি সেলাই মেশিন উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে পাইয়ে দিতে দরখাস্তে সই নেন। এরপর তাঁকে থানায় নিয়ে যান। এরপরই তাঁকে পুলিশ 'ধর্ষিত' হয়েছেন জানিয়ে পুলিশের জিম্মায় রাখে। পরদিন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। পরীক্ষা করাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়া হয়। গায়েবি ধর্ষণের অভিযোগে যে মামলাটি হয়েছে, তাতে চার সাক্ষীর নাম রয়েছে। প্রথম নামটি হাছান বশিরের। পত্রিকায় জানান দেওয়া হয়, যোগাযোগ করা হলে সাক্ষী হাছান বশির বলেন, ধর্ষণের ঘটনা সত্য। আবার আদালতে দাখিল করা ওই নারীর বক্তব্যও সত্য। এই প্রসঙ্গে হাছান বলেন, 'বিষয়টি রাজনৈতিক হয়ে গেছে। আমি ওই দিন থানায় গিয়ে তাঁর কথা শুনেছি। পরে আবার অস্বীকার করতেও শুনেছি'। সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত চলাকালে মন্তব্য করতে অপারগতার কথা জানান (দৈনিক প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০১৮)।

ধর্ষণ প্রসঙ্গে নারীবাদী এই রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিয়ে গবেষণা কাজ করতে গিয়ে বারবার একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, নারীর জন্য নিপীড়নমূলক বাস্তবতায় ভয়ের বিষয়টা আদতে কী? এই ভীতি কোন কোন সামাজিক প্রক্রিয়ার হাত ধরেই ক্রিয়াশীল থাকে? কথ্য ইতিহাসের নারীদের বয়ানে ধর্ষণ অভিজ্ঞতার একটি সাধারণ দিক দেখতে পাওয়া যায়। একাধিক নারী তার অভিজ্ঞতায় ধর্ষণকে চিহ্নিত করেছেন এমন কিছু হিসেবে, যেখানে নিপীড়নের সবচাইতে বড় ভয় *অবিশ্বাসের ভয়*। নারীকে কেউ যৌনাঙ্গে আক্রমণ করবে, আর তাতে নারী হেরে যাবে– এই ভীতির চাইতে অবিশ্বাস, সংশয়, ব্যবহৃত, অপবিত্র হয়ে ওঠার ভয় ধর্ষণকে ধর্ষণ করে তোলে; নারীকে ভোগের বস্তু করে তোলে[৮] (শুভ্রা, ২০০৮)। এই প্রসঙ্গে মির্জাপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে মামলায় হেরে যাওয়া গবেষিত নারীর গণধর্ষণের অভিজ্ঞতার বরাত টানা যায়। তিনি বলছিলেন, *আপনার মা বাবা পরিবারের মানুষ তো মানুষ আপনার পেটের সন্তানও নারী হলে প্রথমে আপনেরে প্রশ্ন করবে ধর্ষণটা আসলে হয়েছে নাকি! এই*

[৮] আমরা এমন একটি পুরুষতান্ত্রিক, পুরুষালি মতাদর্শের সমাজে বসবাস করি, যেখানে নিপীড়নের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্বয়ং 'নিপীড়িত' হওয়ার যোগ্যতা। নিপীড়ন প্রমাণের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, নিপীড়িত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে কি না সেটি প্রমাণের আবশ্যকতা। আইনের পুরুষালি সংস্কৃতি মনে করে, বহুগামী সম্পর্কে থাকা নারীমাত্রই ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ আনছেন। সামাজিক আইন মোতাবেক 'মিথ্যুক' নারীর ধর্ষণ হয় না। 'নিম্নবিত্ত', 'অশিক্ষিত', 'অরুচিশীল', 'মর্যাদাহীন' বিবাহিত কোনো নারীর ধর্ষণ হয় না কারণ তার নিকট 'সম্মান-ইজ্জত', "আদরণীয় বা মূল্যবান নয়"। বাংলাদেশের ধর্ষণ আইনে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি উৎপাদন করে যৌনসম্পর্কে গেলে সেটি ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আইন নিয়ে তর্কবিতর্কের অবকাশ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, আইনে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যৌনসম্পর্ককে ধর্ষণ বলবার এখতিয়ার থাকলেও সাক্ষ্য আইন ব্যবহার করে সেই বিদ্যমান আইনকে খারিজ করে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ২০০৯ সালে কে. হোসাইনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ধর্ষণের মামলার উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এই মামলার অভিযুক্ত ভিকটিমের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়। ভিকটিমের সাথে মিথ্যা বিয়ের নাটক সাজিয়ে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করায় ১৮/১৯ বছর বয়সী ভিকটিম গর্ভবতী হয়ে পড়েন। অভিযুক্ত ভেষজ ঔষধের সাহায্যে গর্ভবতী ভিকটিমের গর্ভপাতের চেষ্টা চালায়। মামলার রায়ে বলা হয়, 'নিজের বিপন্নতার কথা জেনেই পূর্ণবয়স্ক (mature) হতভাগ্য ভিকটিম অভিযুক্তের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে। আর এই সুযোগটাই অভিযুক্ত গ্রহণ করেছে এবং সাড়া দেওয়াটাই একটি মুক্ত সম্মতি তৈরি করেছে। ফলে এই দায়েরকৃত মামলা আদতে কোনো আইনি বাছবিচারের আওতায় পড়ে না' (Case reference : [61 DLR (2009)])। গর্ভের সন্তান অভিযুক্তের প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত ধর্ষণ মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যান। এই একইসূত্রে আমরা যদি সমসাময়িককালে মিডিয়ায় বহুল আলোচিত হ্যাপি-রুবেল মামলার বরাত টানি, তবে প্রাগুক্ত মামলার রায় থেকে ভিন্ন পাবলিক বোঝাপড়া আদতে দেখতে পাই না। হ্যাপি, যিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এবং প্রেমিকের সাথে যৌনসম্পর্কে গেছেন তিনি আদতে কতটা 'দুশ্চরিত্রা', তিনি যে 'মিথ্যুক', তিনি 'যৌনসম্পর্কে আনন্দ নিয়ে এখন ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন'– এরকম অজস্র সামাজিক মন্তব্য মিডিয়া ও সামাজিক মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে। আদালতে মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই, সামাজিক ভাবনাচিন্তার আদালতে চিত্রনায়িকা 'হ্যাপি' 'বানোয়াট'– এই সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, যৌনতায় সম্মতি-অসম্মতি প্রকাশের ক্ষমতা নারীকে পুরুষালি সমাজ কখনোই ব্যক্তিকভাবে, এমনকি সামষ্টিকভাবে অবাধে ধারণ, পোষণ ও প্রকাশ করতে দেয় না। নারীর অসম্মতি তাই সমাজ কাঙ্ক্ষিত পন্থায়, সমাজকাঙ্ক্ষিত নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। আর তাই ধর্ষণ যতটা না নারীর প্রতি সহিংসতা, যতটা নারীর শরীরের প্রতি সহিংসতা, যতটা না নারীর প্রতি কৃত অপরাধ, তার চাইতে বেশি ধর্ষণকে নৈতিকতা, পবিত্রতা, সম্মান, সম্ভ্রম, সতীত্বের অবকাঠামোর মধ্যে দেখা হয় (শুভ্রা, ২০১৩)। ধর্ষণের পুরুষ বা ধর্ষক হিসেবে পুরুষের যে নির্মাণ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও আইনে দেখা যায়, সেটাও এক অর্থে ভীষণ এপিক্যাল। সাক্ষ্য আইনে নারীর ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির অভিযোগকে খারিজ বা মূল্যহীন করবার জন্য যখন দুশ্চরিত্রা ক্লজ বা প্রত্যয় ব্যবহার করা হচ্ছে, মনে রাখা জরুরি ওই একই সময়ে আইন ও সংস্কৃতি, যিনি সামাজিকভাবে 'দুশ্চরিত্রা' নন তাকে এক ধরনের বিশেষ মূল্যমান প্রদান করছে। আরো পরিষ্কার করে বললে, বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, যে নারীর শরীর কোনো পুরুষের স্পর্শ পায় নি বা যে নারী সাংস্কৃতিক অর্থে 'কুমারি', তাকে আইনব্যবস্থাও বিশেষ চোখে দেখছে। এই প্রবণতায় ধর্ষণের ক্ষেত্রেও ধরে নেওয়া হয় ধর্ষকের জন্য 'কুমারীত্ব' একটা মহাপ্রসঙ্গ/আগ্রহ/লালসার ক্ষেত্র। পুরুষালি মতাদর্শ সর্বদা আইনি পরিসরে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মোড়কে 'সাধারণ সামাজিক বোঝাপড়া হিসেবে' বিরাজ করতে সক্ষম হয়, আর তাতে নারী কেবল ভোগের বস্তু হিসেবে বিরাজমান থাকে (শুভ্রা, ২০১৬)।

জায়গাটাতেই মামলা দায়ের করতে গেলে অন্য মামলার সাথে ধর্ষণ মামলার পার্থক্য হয়ে যায়। আপনেরে কেউ খুন করতে চাইছে, এটা লোকে যত সহজে বিশ্বাস করে; আপনে নারী আপনারে কেউ দংশন (ধর্ষণ) করতে চাইছে সেটি ততই তামশার বিষয়। কারে ধর্ষণ করতে পারবে লোকের কাছে সেসবের লিস্টি আছে![৯] এই পরিপ্রেক্ষিতেই ধর্ষণ অপরাপর আইনি অপরাধ, যেমন খুন, অপহরণ, ছিনতাই, গুম, ইত্যাদি যে কোনো ধরন থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠে তার সামাজিক অর্থের জন্য।

৪.

নারীবাদী আন্দোলনের সাথে যে নারীবাদীরা সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন এবং যে নারীবাদীরা তত্ত্বগতভাবে পুরুষালি আধিপত্য ও নারীর অধস্তনতাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন উভয়ের জন্যই 'ধর্ষণ' কেন্দ্রীয় গুরুত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। নারীর প্রতি সহিংসতা তথা ধর্ষণ এমন এক ধরনের ফৌজদারি অপরাধ/ক্রিমিন্যাল অফেন্স, যাকে তার লিঙ্গীয় বিন্যাসের কারণে স্বতন্ত্র হিসেবে [এমনকি 'পিকিউলিয়ার' হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায় (Berger, 1977)] যেমন চিহ্নিত করা যায়, ঠিক তেমনি মনে রাখা জরুরি যে সংস্কৃতিভেদে ধর্ষণকে নারীর প্রতি পুরুষের কৃত নিপীড়ন হিসেবেই নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের সাথে যৌনতা ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের (sexuality and gender) গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। চলতি কথায় আমরা প্রায়ই শুনে থাকি *বাপ ভাইয়ের বিশ্বাস নাই* কিংবা মামলার শুনানিতে অভিযুক্ত বলছেন *রাতের আন্ধারে মাল উঠছিল মাথার ঠিক ছিল না মহামান্য* (বিচারক)! পুরুষের যে একটি সামাজিক মূল্যমানসমেত *মাল* আছে এবং সেটি সামলানোর দায় নারীর উপর বর্তায়, আমরা সামাজিক মানুষরা সেটি শিখে-জেনে ও মেনে নিই– এটি পুরুষালি সাংস্কৃতিক চর্চার বাস্তবতা। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই বাস্তবতা যদি কেবলই লিঙ্গীয় সম্পর্কভিত্তিক এবং আমাদের ধরে নেওয়া বিষম যৌনতাকেন্দ্রিক সারসত্তাবাদী শরীরি (biological determinism) ভাবনার ভিত্তিতে তৈরি হতো; এর সাথে রাজনৈতিক ও ক্ষমতা চর্চার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকত, তবে *ধর্ষক*[১০] অপর ছেলেশিশুকে কিংবা পুরুষকে[১১] ধর্ষণ করত না। সামাজিক

---

[৯] আরো পরিষ্কার হতে দেখতে পারেন, সাক্ষ্য আইন বিষয়ক শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০১৬, *"সতীরই" কেবল ধর্ষণ হয়": সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা*, ব্লাস্ট প্রকাশনী, ঢাকা। এই কেসস্টাডি ব্লাস্টের সাথে সাক্ষ্য আইন বিষয়ক অধিপরামর্শ কাজের অংশ হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

[১০] বাংলাদেশের ধর্ষণ আইন ও মেডিকোলিগেল এভিডেন্স মোতাবেক মুখ্যত পুরুষই ধর্ষক এবং নারী শারীরিক যৌনসঙ্গমের শিকার হতে পারেন। পরবর্তী সময়ে আইন চিকিৎসাজ্ঞান প্রয়োগ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে বিবেচনা করে যে আদতে ওই যৌনসঙ্গম নারীটির তরফ থেকে সম্মতিতে ছিল নাকি জোরপূর্বক/অসম্মতির। এই প্রসঙ্গে ধর্ষণ মামলায় ব্যবহৃত মেডিকেল এভিডেন্স সংগ্রহের পরিপত্র পর্যবেক্ষণভিত্তিক লেখাসমূহ বিবেচনায় আনা যেতে পারে। হাইমেন নতুনভাবে বিচ্ছিন্ন নারী, উন্নত ও শক্ত স্তনের নারী, জখম হওয়া নারী– এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নারী কীভাবে আদালত সংস্কৃতিতে 'ধর্ষণযোগ্য' হয়ে ওঠার ভিক্টোরিয়ান পুরুষতান্ত্রিক 'মি'কে বলবৎ রাখতে কাজ করতে থাকে, মামলার এজাহার, শুনানি ও জবানবন্দি পর্যালোচনা করলে এই সামাজিক চিত্রের ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, বিচারের সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা পর্যালোচনায় লোকচলতি এই ধারণাটি কাজ করতে থাকে যে, পুরুষের শারীরিক যে আকাঙ্ক্ষা আছে সেটি মরিয়া কিসিমের। প্রবাদ প্রবচনে যেমনটা বলা হয়, *রাগ দেখালে পুরুষ হয় বাদশা, আর নারী হয় বেশ্যা*। মেনে নেওয়ার বিষয় হিসেবে স্বীকৃত যে পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-অনুভূতি থাকবে– যার মধ্যে প্রহার-নির্যাতন– দৈহিক নিপীড়ন যেমন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে যৌন নিপীড়নও। রায়ের ক্ষেত্রে পুরুষের সম্মানের উচ্চপদস্থতা– অনেকটা জাতিবর্ণের মাথা-পায়ের বিভাজনের মতো বিভাজন নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়; যেমন একটি রায়ে মহামান্য বিচারক বলছেন, 'অভিযোগকারী (মামলার বিবাদী অর্থাৎ অভিযুক্তের বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসেবে কাজ করতেন) নারী সহজলভ্য, তার মর্যাদা কম। ফলে এই নারীর আনীত অভিযোগ বিশ্বাস করা যায় না, আদালত সহজলভ্য এই নারীর ধর্ষণের অভিযোগের ওপর আস্থা রাখবার মতো কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ হাতে পায়নি'। 'কাজের মেয়ে সহজলভ্য'– এই অবস্থান বিচারে মামলা খারিজ হয়ে যায় (Case reference : [30 BLD

কাঙ্ক্ষিত ধারণা মোতাবেক ধর্ষক ও ধর্ষিতা/ধর্ষণের ভিকটিম সর্বদা একটি দ্বৈতজোড়ের লিঙ্গীয় বিন্যাসে বিন্যস্ত থাকে[১১]। জেলহাজতে ১১ বছরের ছাত্রকে পায়ুপথে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার মামলায় আটক থাকা অভিযুক্তের পক্ষের সাক্ষী সাক্ষাৎকারে বলেন, *ভাইগ্গার নিজেরও তো বয়স কম! বিশ-বাইশ! এই সময়*

(AD) 2010])। সমাজে ধর্ষকপক্ষ যেহেতু সবসময় এই শারীরিক মরিয়া যৌন লালসা/আকাঙ্ক্ষাহেতু নারী/ভিকটিমের উপর বর্তানোর কোনো না কোনো রাস্তা তৈরি করতে পারেন, মরিয়াত্ব বর্তানোর উপায় না পেলেও নিপীড়নের অভিযোগ উত্থাপনের পেছনের কারণসমূহ খুঁজে বের করেন, যাতে নারী কত কতভাবে মিথ্যা অভিযোগ এনে পুরুষকে ফান্দে ফেলার গল্প তৈরি করবার বাস্তবতা স্বীকৃত ও বৈধতা পায়। ফলে এই সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ধর্ষণের মিথের শর্তাবলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর পক্ষে পূরণ একটি দৈবাৎ ঘটনাবিশেষ, সেটিও বিবিধ এজেন্সি গ্রুপের মধ্যকার দরকষাকষির বিষয়– যা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনেক সময় পুরুষালি রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে (শুভ্রা, ২০১৩; ২০১৬; ২০১৭)।

[১১] রহমান, আমিনুর, ২০১৪, '*মাগি তোরে এমন অষুদ দিমু যার এ্যাকশন থাকবো দশমাস' : ধর্ষণের রাজনৈতিক অর্থনীতি পুনর্ভাবনায়ন*, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক পর্যায়ের মনোগ্রাফ (অপ্রকাশিত)। মনোগ্রাফটির তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক হিসেবে আমাকে অ্যাকাডেমিক্যালি নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীর সাথে যৌথ গবেষণাযাত্রায় পুরুষের ধর্ষণ অভিজ্ঞতা দেখতে চেয়েছিলাম। এই গবেষণার একটি কেসস্টাডি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এক ছাত্রের ধর্ষণ অভিজ্ঞতা। ছাত্রটি মফস্বল থেকে এসে মেসবাড়িতে অপর ছাত্রদের সাথে থাকতেন। সেখানেই তিনি একাধিক ছাত্র কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হোন এবং পুরো ঘটনাটি মোবাইলে ধারণ করে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে বারবার সে যে যথেষ্ট 'পুরুষ' নয়, মেয়েলি আর সে কারণে সবাই মিলে তাকে নষ্ট করেছে– এই স্টিগমাটাইজেশানের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে ওই ছাত্রটিকে দিয়েই মেসবাসার যাবতীয় কাজ করিয়ে নেওয়া হতো। অনলাইনে ভিডিও ছেড়ে দেওয়া হবে– এই হুমকি দিয়ে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার ঝুঁকিতে ফেলে বিবিধ নেতিবাচক ও অসম কাজ সম্পাদন প্রচেষ্টার বাস্তবতাটিই পুরুষ ধর্ষণের বাস্তবতা।

[১২] প্রসঙ্গটা টেবিল হলো টেবিল গল্পটার মতো। পুরুষের যৌনাঙ্গ 'শিশ্ন'কে যে আমরা শিশ্নই বলি চালকুমড়া কিংবা গাব বলি না এটা একান্তই কাকতাল। শিশ্ন যে শিশ্ন হয়ে ওঠে সেটি সামাজিক, কিন্তু হয়ে ওঠার বিষয়টি শরীরি/বায়োলজিক্যাল। পুরুষের মাল মাথায় উঠলে তার হুঁশ থাকে না, তখন লিঙ্গীয় সম্পর্ক তার জন্য কোনো বিষয় নয়, এই কারণেই ছেলে/মেয়েশিশু, পুরুষ/নারী– যে কেউই ক্ষমতাহীনতার সাপেক্ষে তার ধর্ষণের ভিকটিম হয়ে উঠতে পারেন। এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের আত্মপরিচয়ের মানুষও। ধর্ষণকে বায়োলজিক্যাল সারসত্তাবাদ থেকে দেখলে পুরুষ ধর্ষক কেবল নারীকে ধর্ষণ করত; আর পুরুষের ধর্ষণ অভিজ্ঞতা কেবল নারী কর্তৃকই সম্পন্ন হতো। আদতে পুরুষালি সমাজে, *বাবা ভাইয়ের* কাছে বিশ্বাস নাই– এই প্রবাদে কেবল মেয়েশিশু না ছেলেশিশুও যে নিরাপদ নয় এই সামাজিক চৈতন্য সমাজে, মূলত মধ্যবিত্ত সমাজে ঘুরতে থাকে। সেটি আমরা প্রকাশ্যে স্বীকার করি বা না করি। তথ্যমতে, চেনা পরিসরে চেনা সম্পর্কেই সবচাইতে বেশি নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। কিন্তু একটি নিপীড়নবর্জিত মধ্যবিত্তসুলভ আপাত 'সুন্দর' পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গুরুশিষ্য, আদালত ইত্যাদি যাবতীয় সম্পর্ক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সামাজিক মানুষ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ, পুরুষতান্ত্রিক এজেন্ট হিসেবে রাখঢাক করে চলে। যেখানে (একান্তই যদি 'নিপীড়ক' চেহারা ধরা খেয়ে যায়) ভিকটিম/নিপীড়িতের কোনো না কোনো নিপীড়ন উসকে দেওয়ার মতো দোষ/সমস্যা কিংবা ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়, যাতে নিপীড়িত হওয়ার সামাজিক যোগ্যতা লঘু হয়, প্রতিষ্ঠা করা যায় নারী মিথ্যা নিপীড়নের গল্প ফাঁদে; নারী 'মিথ্যা বলছে'। নিপীড়নের কেচ্ছা বিক্রি করে যে নারী, সে আসলে সামাজিক ভাবনায় 'যৌনতা' বিক্রি করছে, আদতে সে 'বেশ্যা'। এই কারণেই সদ্য সাইবার স্পেসে *#মি টু* আন্দোলনের যে জোয়ার দেখা গেল, তাতে নারীর বলা বিগত নিপীড়ন অভিজ্ঞতায় বহুধা পুরুষালি এজেন্ট তথা পুরুষের নিপীড়ক হয়ে ওঠার প্রবণতাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রবল পুরুষতন্ত্র বিশ্বজুড়ে নারীর বিগত যৌন আক্রমণের ইতিহাসকে, নিপীড়নের অভিজ্ঞতাকে খারিজ করে দেয়, নাকচ করে দেয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে জাবির নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্টজন সেলিম আল দীন প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীর নিপীড়ন অভিজ্ঞতা একটি ওয়েব পোর্টালে ছাপা হলে তাকেও বেশ্যা হিসেবে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, সমাজে বেশ্যা তো নিপীড়িত শোষিত শ্রেণিরই একজন, শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের একজন। শ্রেণিঅসমতার কালে আমাকে কেউ শ্রমিক বললে যেমন গাল হওয়ার কথা না, বেশ্যাও গালি হওয়ার কথা না। বরং বেশ্যার খদ্দের, যিনি কিনা সমাজে নারীর যৌনতা বিক্রিবাট্টার নাজুকতাকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে যৌনশ্রম কিনে নেন, ভোগ করেন, কখনো বা কোনো মূল্যই দেন না– সেটি লেবাস লাগানোর জন্য গালাগালি হিসেবে সুনির্দিষ্ট হতে পারে। নারীবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের জায়গা থেকে আমি নিপীড়কের বেটাগিরি নিপাত যাক– এই স্লোগান বরং তুলতে চাই।

রক্ত গরম থাকে, হাতের কাছে কিছু ছিল না। শরীর মানতেছিল না। আমাদের কাছে ভুল স্বীকার করছে। মনের ভেতর তার অনেক ভয় কাজ করতেছে। ছোট মানুষের ভুল হয়ে গেছে। এত বড় শাস্তি ক্ষণিক ভুলের জন্য দেওয়াটা অন্যায়। ছেলে ছেলে এরকম শরমের মৌজ কম বয়সে নেয়... এইগুলারে ধরলে চলে![১৩]

ধর্ষণ তথা নারীর প্রতি নিপীড়নের বিবিধ ধরনকে বাংলাদেশের এই বোঝাপড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মোকাবেলা করতে গেলে এখানকার লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের যে একটি শরীর নির্দিষ্ট বাস্তবতা রয়েছে সেটিকে খারিজ করে দেওয়া যাবে না। আরো পরিষ্কার করে বললে, ধর্ষণ ক্ষমতা আমাদের এখানকার বাস্তবতায় একটি জৈবিক বাস্তবতা হিসেবে সামাজিকজ্ঞানে অর্জিত হয়। অর্জনের পন্থা সাংস্কৃতিক কিন্তু ফলাফল জৈবিক/সারসত্তাবাদী/বাই ডিফল্ট হিসেবে বৈধতা পায়। আর এই *মরিয়াজ্ঞান* পুরুষ মাত্র সারসত্তাগত বলে ধরে নেয়। এই কারণে পুরুষের শরীর, ধর্ষকের শরীর হলেও সামাজিকভাবে কোনো হেরফের তৈরি করে না; বরং সামাজিকভাবে শেখানে হয় *বেটামানুষ তো হাঁসের মতো, পানিতে নামবে জল লাগবে না*! অন্যপক্ষে নারীর শরীর জৈবিক ও সামাজিক উভয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ নজরদারির বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্ষণের বায়োলজিক্যাল কিংবা শরীরি দিক ঐতিহাসিকভাবে নানা ফর্মে এই উত্তর পুঁজিবাদী সময়ে আকৃতি পাচ্ছে[১৪] এবং তাতে নিপীড়ন তথা ধর্ষণ একটি বৈশ্বিক *বীভৎস* উদযাপনের রূপ প্রাপ্ত হয় (শুভ্রা,

---

[১৩] ২০১৪-২০১৫ সালে ব্লাস্টের সাথে সাক্ষ্য আইন বিষয়ক অধিপরামর্শক হিসেবে গবেষণা কাজ করবার অংশ হিসেবে জেলখানায় এথনোগ্রাফি সম্পন্ন করা হয়। এই তথ্য সেই গবেষণার অংশবিশেষ।

[১৪] সাধারণ জ্ঞানে ফ্রয়েডের লিবিডোর ভিত্তিতে ব্যক্তি মানুষের ভেতরকার সহজাত জৈবিক তাড়নাকেই যৌনতা (Sexuality) বলে চিহ্নিত করা হয়। যৌনতা ব্যক্তির বিশিষ্ট যৌনময় আচরণের কথা বলে। সামাজিক পরিচিতি নির্মাণে যৌনতার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (Andermahr, 2000)। নারীবাদী লেখালেখি সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের 'উত্তেজক' (erotic) চিহ্নগুলোকে যৌনতা বলে নির্দিষ্ট করে। উত্তেজনা ব্যক্তির ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, চর্চা কিংবা নিজস্ব নির্মাণের বিষয় নয়, যৌনতা কেবল ব্যক্তির নৈতিক অনৈতিকতার চর্চা নয়। কোন সময়ে জৈবিক তাড়না কীরূপে চর্চিত হবে, চর্চিত হবে কি হবে না, উত্তেজনার সম্ভাবনা কেমন, অনুমোদিত নাকি অবৈধ, আনন্দ নাকি নিরানন্দ সামাজিক নানান বোঝাপড়া আর ডিসকোর্সসমেত যৌনতার জৈবিক তাড়না আকৃতি পায় (জ্যাকসন এবং স্কট, ২০০০)। সামজিক যৌনতার ধারণায় উত্তেজক আচরণ কিংবা উত্তেজিত সময় নিশ্চল বিষয় নয়। সামাজিক যৌনতা সর্বজনীনতাকে খারিজ করে দেয়, সংস্কৃতিভেদে বিভিন্ন ধরন তৈরি করে (Gagon and Parker, 1995)। নারীবাদীরা সর্বজনীন যৌনতার বাইরে যৌনতার রাজনীতিকে তাদের আলোচনায় গুরুত্বারোপ করেন। উনিশ এবং বিশ দুই শতকে নারীর নিরানন্দময় যৌনতার প্রদত্ত ভাবনা সমালোচিত হয় (ব্রান্ড, ১৯৮৬)। যৌনময়তা নিষেধাজ্ঞা, বিপদ, আশঙ্কার মতোই নারীর এজেন্সি, আনন্দ আর আবিষ্কারের রাজ্য। কেবল নারীর যৌনতার আনন্দ গুরুত্ব পেলে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অবদমনমূলক চরিত্র খারিজ হয়ে যায়, আবার কেবলই নারী সহিংসতাকে দেখলে নারীর পছন্দ, তার যৌনতার এজেন্সি খারিজ করে দেয়া হয় (Vance, 1984)। এই বাস্তবতায় নারীবাদীদের কাজ স্পষ্ট করে পর্নোগ্রাফিসহ শরীরি নানান জ্ঞানে পুরুষনির্ভর যৌনময়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যৌনতা মানে বিশেষ একটি 'যৌনকাজ', আর পুরুষের সাথে বিষমযৌনতার 'যৌনসঙ্গম' উদযাপনই একমাত্র আনন্দময় যৌনকাজ (Geer 1971, Hite 1988, Koedt 1974, Jeffreys 1985, ackson & Scott 1996, Millet 1971, McIntosh 1993, Allen 1982, Gilman 1985, Marshall 1994, Porter & Hall 1995, Cranny-Francis 1995)। প্রভাবশালী ভাবনায় নারীর যৌনতা হয় আনন্দের নতুবা নিরানন্দের। এই দুই বিপরীত ভাবনা ছাড়া যৌনতা উপলব্ধির কোনো সুযোগ নেই (McIntosh 1993, Fuss 1989)। যৌনতা এই বিপরীতমুখী অর্থে শেষ পর্যন্ত উদযাপনভেদে (হোমোসেক্সুয়াল, হেটারোসেক্সুয়াল, বাই, কুয়ের, ট্রান্স ইত্যাদি ইত্যাদি) কেবল বিশেষ ক্রিয়াই থেকে যায় (Millett 1986, Kemp & Squires 1997)।

যৌনতার এই বোঝাপড়া প্রদত্তভাবে যৌনতাকে কিছু একটা শরীরি, বাহ্যিক, ভৌত, জৈবিক হিসেবে চিহ্নিত করে। এই জৈবিকতার সাথে সামাজিক অনুমোদন কিংবা অনুমোদনহীনতা মিলেমিশে যায়। সামাজিক অযৌন সম্পর্কে কিংবা যে যে পরিসরকে নারী অযৌন ভাবেন কিংবা নারী যে যে সম্পর্কে যৌনতা উদযাপন করতে চান না সেই সামাজিক চাহিদা এবং প্রেক্ষিতে যৌনতার নিপীড়নমূলক চেহারার আদর্শ তৈরি হয়, আদর্শ থমকায়, নারী অসম্মতির যৌনতা উদযাপনে নিরানন্দ সময়

২০০৮[১৫]), আকৃতিপ্রাপ্ত শরীর সারসত্তাবাদী হয়ে ওঠে সামাজিক চর্চা ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, শরীর তার ধরনে পাকাপোক্ত হয়; পারফরমেন্সের মধ্য দিয়ে[১৬]।

ধর্ষণকে 'বস্তুনিষ্ঠ' এক ধরনের সমাজের বাইরের (*আইনের চোখ বাঁধা*) আইন দিয়ে বিচার বিবেচনা করা হয়– এই মহাবয়ান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলেও সমুদয় সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থময়তা বিচারিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বলবৎ থাকে। পুলিশী, আদালত এবং বিচার সংস্কৃতিতে ধর্ষণকে 'পরখ' করবার বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত হয়ে যে সকল সামাজিক মানুষ কাজ করছেন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক বিভিন্ন ধাপে,

---

কাটান। আবার নারীর যৌনতা উদযাপনের অনুভূতি, শরীরি আবিষ্কার, উত্তেজনা, মানবিক ছোঁয়াছুঁয়ি, সংবেদনশীলতা, অযৌক্তিক আবেগ নারীকে আনন্দ দেয় (Vance 1984)। প্রথমত এই আনন্দ আর সংবেদনশীলতার ক্যারিক্যাচার পুরুষালি উদারনৈতিক রোম্যান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। যৌনতার আনন্দের বিন্যাস প্রথাগত ভাবনায় অনেক বেশি করে সামাজিক অনুমোদন আর বৈধতায় আকৃতি পায় (যেখানে স্বামীর সাথে কখনোই ধর্ষণ হতে পারে না, স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন মাত্র সহজাত, ধর্ষক মানেই বহিরাগত, আপন কেউ নয়, ধর্ষণ যৌনমিলন নয় বরং অন্য কিছু, নারী স্বামীর সাথে আনন্দময় যৌনমিলনে যাবেন, অঘটনেই কেবল ধর্ষকের সাথে নারীর যৌন সংযোগ ঘটে, স্বামীসঙ্গ বাদে অপর সকল যৌনতা উদযাপনে ধর্ষণের বীজ প্রোথিত থাকে, নিরানন্দের সম্ভাবনা থাকে)। অর্থাৎ নারী যে যে বিশিষ্ট পরিসরে যৌনতা উদযাপনের আশা করে কিংবা অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়– সে সে সম্পর্ক এবং পরিসরে নারীর যৌনানন্দ উপভোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়। 'যৌনতার এই আদর্শ ইঙ্গিত করে সামাজিক নারী কেবলই জৈবিকতায় যৌনানন্দ অনুভব করার ক্ষমতা রাখে না' (Dworkin 1981, Light 1984, Vance 1984, Sedgwick 1985)। উত্তর-পুঁজিবাদী সমাজ বাস্তবতায় যৌনতার আনন্দ পর্নোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্যে বহুমাত্রিক দৃশ্যগত (visual) ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে।

[১৫] শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৮ (ডিসেম্বর), *'পর্দার' ধারণা ও অনুশীলন : বিভিন্ন পরিমণ্ডলে নারীর অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সম্পাদিত থিসিস, অপ্রকাশিত।

[১৬] উত্তরাধুনিক নারীবাদী তত্ত্বায়ণ স্পষ্ট করে মানুষ জন্মের পর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এবং সামাজিক এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে/আত্মকে নির্মাণ শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় সে 'নারীসুলভ' বৈশিষ্ট্য কিংবা 'পুরুষালি' আচরণের ধরনকে রপ্ত করার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গীয় পরিচিতি ধারণ করে। সমাজে লিঙ্গকে ধারণায়নের ক্ষেত্রে বিষমকামিতার যে প্রবল বিন্যাস রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই আদতে সকল মানুষকে প্রধানত নারীত্ব ও পৌরুষ এই দুই ধরনের লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যে ফেলা হয়ে থাকে। জুডিথ বাটলার লিঙ্গীয় বোধের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক উপস্থিতিকে (প্রাকৃতিকীকরণ) খারিজ করে দিয়ে যুক্তি দেখান যে, নারী ও পুরুষ এবং সমকামিতা ও বিষমকামিতার মধ্যকার যে ভিন্নতা তা আসলে প্রতীকী নির্মাণ, যা একটি সামাজিক বাছাইয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়। তাঁর Performativity তত্ত্ব সেক্স/জেন্ডার বিভাজনকে ভেঙে দিয়ে এই যুক্তি দাঁড় করায় যে এমন কোনো সেক্স নেই, যা ইতোমধ্যেই কোনো লিঙ্গ না (Salih, 2002)। তিনি মনে করেন, লিঙ্গ এবং যৌনতা পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, যেমন বিষমকামিতা সমকামিতা থেকে প্রভেদ তৈরির মধ্য দিয়েই গঠিত হয়েছে। তাঁর মতে, যৌনতার 'আসল' ধরন হিসেবে বিষমকামিতাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মধ্য দিয়ে মূলত সমকামিতাকে 'নকল' বা ভ্রান্ত ধরন হিসেবে দেখানো হয়। তেমনি পুরুষ/নারীর স্থির বিভাজনও অন্যান্য লিঙ্গের বিভিন্ন ধরনের কারণে ঝুঁকির মধ্যে থাকে। সমাজে যখন থেকে একজন ব্যক্তির উপস্থিতি তৈরি হয়, তখন থেকেই সে লিঙ্গায়িত (gendered) হয়ে যায়, অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক শরীর' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। মানে একজন ব্যক্তি নিজে যা তা আসলে তার লিঙ্গ না বরং লিঙ্গ নির্দেশ করে ওই ব্যক্তি যা করে তাকে, একরাশি কর্মকে এবং এটা বিশেষ্যকে না বুঝিয়ে বরং ক্রিয়াকেই নির্দেশ করে। বাটলারের মতে লিঙ্গীয় পরিচয় হলো 'একরাশি পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ, যা প্রকট নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর মধ্যে ঘটে'। এই তত্ত্বীয় ব্যাখ্যায় বাটলার স্পষ্ট করেছেন, সামাজিক ব্যক্তি/সাবজেক্ট তার লিঙ্গকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয় বরং সে একটা নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোতে নিজেকে দেখতে পায়, যেখানে তার লিঙ্গ পূর্বনির্ধারিত কিংবা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। performativity তত্ত্ব অনুযায়ী একজন মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে একটি ছাঁচের মধ্যে বেড়ে ওঠে, যেখানে সে তার লিঙ্গকে অর্জন করে এবং তা তার আচরণের ধরনও নির্ধারণ করে দেয়। আর ব্যক্তি সমাজনির্দেশিত পন্থাতেই লিঙ্গকে অনুশীলন/চর্চা (perform) করে। যেমন আমরা যখন মাত্র জন্ম নেওয়া শিশুকে বলি 'এটা একটা মেয়ে', এটাই মূলত মেয়েকরণ (girling) প্রক্রিয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা (Brickell, 2005)। গুরুত্বপূর্ণ হলো এই পারফর্মেটিভিটিকেই সামাজিক মানুষ শরীরি সারসত্তাবাদী হিসেবে প্রদত্ত বলে জ্ঞান করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষমতাসমেত– তাদের মাঝে সামাজিক যৌনতার ধারণা ক্রিয়াশীল থাকে এবং মগজে-মননে-চর্চায় সেই সামাজিক *নারীবিদ্বেষী* ধারণাসমেতই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের বাস্তবতাকে মোকাবেলা করেন (Adler, Z., 1987; শুভ্রা, ২০০৭; ২০০৮; ২০০৯a; ২০০৯b ২০১১; ২০১৩; ২০১৬)।

মনে রাখা জরুরি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগকারী মূলত প্রধান সাক্ষী হয়ে থাকেন। তিনি মূলত নারী, সচরাচর পুলিশ প্রশাসন ও বিচারালয়ের সংস্কৃতি ভিকটিম ও অভিযোগকারীণিকে 'প্রশ্নসাপেক্ষ' ও সামাজিকভাবে নেতিবাচক হিসেবে দেখে থাকেন (Naffine, 1992; Edwards, 1996; O'Neill, M., 1996; শুভ্রা, ২০০৮; ২০১৬)। খুন, জখম, গুম, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধসমূহেরও লিঙ্গীয় বিন্যাস রয়েছে[১৭]। তবে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে *বিশিষ্ট* হয়ে ওঠে তার লিঙ্গীয় বিন্যাসের কারণেই, যাকে কোর্ট-কাচারিতে *নারীঘটিত/নিপীড়ন কেইস মাম্মা* বলে তামাশাও করা হয় এবং সত্যিকার অর্থে খুনের মতো ধর্ষণ *অপরাধ* হিসেবে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে 'উচ্চতর' নয়। যে কারণে ভিকটিম বলেন, *আমাকে নষ্ট না করে মেরে ফেললেও তো হতো, সম্মানটা থাকত*[১৮]!

বাংলাদেশের পুরুষালি মতাদর্শের সমাজে নারীর শরীরকে পুরুষালি ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি জায়গা হিসেবে দেখা হয়। মানে ধরেন, রাজনৈতিক কারণে যদি কোনো পুরুষকে হেনস্তা করতে হয় তবে তাকে ধরে প্রহার করা হবে কিন্তু একজন নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হবে কিংবা নারীটির ওড়না ধরে টান দেওয়া হবে (শুভ্রা, ২০০৮)। অর্থাৎ, সহিংসতার একটি লিঙ্গীয় বিন্যাস রয়েছে (কান্নাবিরান, ১৯৯৬)। কেবল নারী পরিচয়ের জন্যই কিছু কিছু সহিংসতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করে চলে, বলবৎ রাখে। এই অবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এই ভাবনাও পুরুষালি এজেন্টের মধ্যে তৈরি করে যে কেবল 'পুরুষ' হিসেবেই তার নারীর সম্মতি-অসম্মতির ঊর্ধ্বে 'যৌনক্রিয়া'র অধিকার রয়েছে (রেডফোর্ড ও কেলি, ১৯৯৬)। এই পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাসের জোর বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮২ ভাগ পুরুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং শহুরে শতকরা ৭৯ ভাগ পুরুষ মনে করেন এই যৌন সক্ষমতার জোরই কম-বেশি ধর্ষণকে সম্ভবপর করে তোলে[১৯]। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন

---

[১৭] *অভিজ্ঞতায় ধর্ষণ*, *বহুমাত্রিক সহিংসতা*, *নারী জীবনের পুনর্গঠন* শীর্ষক গবেষণাকাজে সংগৃহীত কেসস্টাডিতে দেখা গেছে, পাচারের ক্ষেত্রে নারীকে পাচার করবার পর পরই বিভিন্ন কৌশলে ধর্ষণ করা হয়। একজন সার্ভাইভার নারী জানান, বেনাপোল বর্ডার পার করার জন্য তাকে যে বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়, তিনি বুঝতে পারতেন সেখানে তার সাথে আরো কয়েকজন নারী আছেন। নারী কয়েকজনকে আলাদা আলাদা কক্ষে রাখা হতো এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘরের দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও কোনো আটককৃত নারীই কক্ষ থেকে বের হতেন না। কারণ মাঝের কমন স্পেসে কাপড় খুলে নগ্ন ৭/৮ জন 'বেটা লোক' বসে তাশ/জুয়া খেলতেন। কোনো নারী নড়াচড়া করলেই ভয়ংকর দেখতে কোনো একজন ওই কক্ষে ঢুকে দরজা খুলে নারীটিকে ধর্ষণ করত। তিনি বলছিলেন, ওই সময়ের বীভৎসতা তার পুরো জীবনকে বদলিয়ে দিয়েছে। তিনি কোনোভাবেই স্বাভাবিক মানুষের জীবনে ফিরতে চান না। কারণ তাকে তো তার নিজের মামাই পাচার দলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। বেনাপোল বর্ডার থেকে উদ্ধার হওয়ার পর তিনি আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন, এখানেই থাকতে চান (শুভ্রা, ২০০৭)।

[১৮] পুরুষালি সমাজে বেড়ে উঠতে গিয়ে নারী শরীরি শুচিতার যে সামাজিক শিক্ষা অর্জন করে, তাতে তার কাছে 'নিপীড়িত' হওয়া বা সামাজিকভাবে সম্ভ্রমহানির শিকার হওয়ার চাইতে 'জীবন' চলে যাওয়া অনেক বেশি শ্রেয়তর মনে হয়। তার একটি খুব সাধারণ উদাহরণ দেখতে পাবেন ফিল্ম দুনিয়ায়। দেখবেন ধর্ষণের ভিকটিম নায়িকা কখনোই সিনেমায় শেষ অবধি বেঁচে থাকে না।

[১৯] *Why Do Some Men Use Violence against Women and How Can We Prevent It? Quantitative Findings from the UN Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific*, UN Study, 10 September 2013.

হয়রানি এবং ধর্ষণের বিষয়টি আদতে পুরুষালি সংস্কৃতি, পুরুষালি আচরণ, পুরুষালি কাঠামো এমনকি পুরুষালি জ্ঞান-আইন-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রমাগত অনুকূল পরিস্থিতি পেতে থাকে। অর্থাৎ, বৃহত্তর সমাজের বিরাজমার অসমতার সাথে নারীর প্রতি সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক অপরাপর অসমতা আর লিঙ্গীয় অসমতা কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়, কিংবা লিঙ্গীয় নিপীড়ন কোনো একক ঘটনা নয়। বরং পারস্পরিক বিনুনীর মতো পেঁচিয়ে থাকে (শুভ্রা, ২০০৭)। এই সূত্রে ধর্ষণ মামলা ও তার বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাক্ষীর সাক্ষ্য ও তার সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার সামাজিক বিশ্লেষণের প্রয়াস রাখি।

৬.

মধ্যযুগ থেকেই 'আইনের শাসন আদতে ক্ষমতার শাসন' আর সেটি মানুষ মেনেও নেয় (ফুকো, ১৯৭৯)। শাসনমনস্কতার সাথে যে জ্ঞানের সম্পর্ক আছে তার সাথে অতি অবশ্যই শাস্তি বিধান জরুরি। ক্যাথলিক, রোমান কিংবা নেপোলিয়ান যুগের আইনি ব্যবস্থায়ও প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি আইনকানুন সামাজিক অসমতা বলবৎ রাখার কৌশল হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকত। আইনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে শ্রেণিবিভাজন সমাজে বিরাজ করেছে, তার ভিত্তিতে মানুষের সামাজিক মর্যাদা, লিঙ্গীয় পরিচয় ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে শাস্তির ধরন পালটে যেত। অর্থাৎ, আইন সকল নাগরিকের জন্য সমান, এরকম স্লোগান মধ্যযুগীয় শাসনামলে বর্তমান ছিল না। যেহেতু দাস মালিকের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো, ফলে আইনগতভাবে দাসকে ধর্ষণ কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো না। বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণিভেদে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল, নিরুৎসাহিত করা হতো এবং শতকজুড়ে বেশ্যাকে ধর্ষণ কোনো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় নি। ধর্ষণ নারীর সম্ভ্রম ও সততার প্রতিকৃত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো, যার কারণে নারীর পরিবারের সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপদস্ত হবে (Brownmiller, 1975; Vigarello, 1998; Bourke, 2007; Ventura, 2017)। আইনের এই ডিসকোর্স নারীর একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বিয়েকে সাব্যস্ত/নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল (Beleza, 1990)। ততক্ষণই নারী 'বিবাহযোগ্য' থাকতে পারেন যতক্ষণ তিনি সম্ভ্রম (decent) নিয়ে, ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকেন। এই সামাজিক বোঝাপড়া আইনি ডিসকোর্সে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক প্রাবল্যসমেত উপস্থিত থেকে বারংবার ধর্ষিত অবিবাহিত নারীকে তারই ধর্ষককে বিয়ে করবার জন্য উৎসাহ দিয়ে গেছে। কারণ ধরেই নেওয়া হতো, যিনি তার 'সতীত্ব' (virginity) হারিয়েছেন, তার পক্ষে ভালো বিয়ের প্রস্তাব তো দূর, আদৌ বিয়ে করাই সম্ভব না (Ventura, 2017)। গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশের ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে এই ঔপনিবেশিক বোঝাপড়াগুলো ধর্ষণ তথা নারীর প্রতি সহিংসতা বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাববার কোনো কারণ নেই[১০]।

গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যে বাস্তবতাটি দেখা যায় সেটি হলো সামাজিকভাবে সাংস্কৃতিক মননে একটি গভীরতর বিশ্বাসের শেকড় গ্রথিত থাকে যে *ধর্ষণের অভিযোগ খুব সহজে করা যায়* এবং এই অভিযোগ এনে *কাউকে ঘায়েল করাটাও সামাজিকভাবে খুব সহজ* (শুভ্রা ২০১৩; ২০১৬)। আসামিপক্ষের সাক্ষীরা একাধিকবার এই সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন যে *যৌতুক ও বাড়ির চেনা পুরুষদের বিরুদ্ধে যৌতুক না দেওয়ার কারণে যে ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়েছে সেসব মিথ্যা। অভিযোগকারী, তাদের বাড়ির বউয়ের*

[১০] উপনিবেশের পূর্বে এই অঞ্চলের কোনো নারীবিদ্বেষী অবস্থান ছিল না এরকম রোমান্টিক ধ্যানধারণা গবেষক হিসেবে আমি উপস্থিত করতে চাইছি না। গবেষণার উদ্দেশ্য যেহেতু সাক্ষ্য আইনের একটি বিশেষ ধারা, ফলে তার ইতিহাস বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি বিশেষভাবে এই গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। উপনিবেশ পূর্বের নারীর যৌনতা কীরূপে বিরাজমান ছিল সে ইতিহাস পুনর্নির্মাণে আরেকটি গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

চরিত্র খারাপ, স্বামীর অবর্তমানে ফষ্টিনষ্টি করতে চেয়েছিল। বউ তার স্বামীর বাড়ি থেকে অর্থ চুরি করে পালিয়েছে। এখন মিথ্যা নারী নিপীড়ন মামলা করেছে। কারণ এই মামলায় বেল নাই। জেল থেকে বেরোতে পারবে না[১১]। সাংস্কৃতিক মনন শক্তপোক্তভাবে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে ধর্ষণ মামলার বেশিরভাগই ভুয়া, নারীরা ধর্ষণের যে অভিযোগ আনে সেটিকে মিথ্যা ধরে নেওয়ার এই প্রবণতা সমাজের সামষ্টিক *পুরুষালি চৈতন্যের* প্রবণতা। এই সমগ্র সামাজিক বাস্তবতা নারীকে– তিনি বাদী, ভিকটিম, সার্ভাইভার কিংবা অভিযোগকারী বা একমাত্র সাক্ষীও হতে পারেন– মামলার ট্রায়ালে রাখার বাস্তবতাকে আপাদমস্তক 'বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রশ্নাতীত বৈধতা' দিয়ে দেয়। ধর্ষণ মামলার মেডিকেল সনদের পদ্ধতি থেকে শুরু করে বিচারিক প্রক্রিয়ার সকল ধাপ নারীর অতীত যৌন আক্রমণ, হয়রানি এবং নির্যাতনের ইতিহাস নয়, বরং নারীর অতীত যৌন ইতিহাস দেখতে আগ্রহী থাকে (শুভ্রা, ২০১৩)।

জুডিশিয়াল ডিসকোর্স কিংবা আদালতের যে ভাষা সেটি আমরা যারা কিনা আইনের মানুষ নই, তাদের কাছে বিশেষভাবে অচেনা মনে হতে পারে। মামলার সময় শুনানিতে যা কিছু ঘটেছে তার নিবিড় বর্ণনা শোনা/ জানার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যখনই মামলার শুনানিতে ভিকটিম/সার্ভাইভার কিংবা তার পক্ষীয় কেউ ভয়ংকর/বীভৎস সেই নিপীড়ন ঘটনার বর্ণনা কীভাবে দিবেন/দিতে পারছেন না বলে স্বীকার করেন, সেটি আদালতকক্ষে 'আইনের ভাষা জানা না থাকার অজ্ঞানতাকেই নির্দেশ করে' (Branco, 2014)। জরুরি হলো, আইনের বয়ান যা ঘটেছে সেটিকে স্পষ্ট করতে বলে, পরিষ্কারভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে পরিক্রমায় সাজিয়ে উপস্থিত করার প্রক্রিয়াই আসলে আইনের কাঙ্ক্ষিত বয়ান। যা কিছু আইনগতভাবে অভিযোগের সপক্ষে যাবে, যেমন, দেখা যায় এমন ধরনের শারীরিক ক্ষত/জখমের চিহ্ন, দেখা যায় না এমন কিছুও প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে, যেগুলো ফরেনসিক এক্সপার্ট রিপোর্টে উল্লেখ করবেন, মৌখিক অপমানজনক কথাবার্তার সাক্ষ্য দিবেন অপর মানুষজন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, নারীর প্রতি সহিংসতা তথা ধর্ষণের লড়াইটা লড়তে হলে বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়নকারী/বাদীপক্ষকে আদালতকক্ষে যতরকমের স্পর্শযোগ্য, প্রত্যক্ষণযোগ্য ক্ষতির তালিকা প্রদর্শন করতে পারবেন ততই উত্তম; যার ভিত্তিতে আইন অপরাধকে/অপরাধের মাত্রাকে পরিমাপ করবে।

গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্ষণের মামলা আদতে বিচারের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, শুনানির মূল লক্ষ্যই থাকে সামাজিক বৈধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ভিকটিমের আইনি চাহিদা পূরণের জন্য আদালত বিচার করতে বসে নি। আর তাই পুরো বিচার প্রক্রিয়াটি চলে রাষ্ট্র আর অভিযুক্তের মধ্যে, যেখানে ভিকটিম আদতে খোদ সাক্ষ্য হিসেবে ট্রায়ালে থাকে। ভিকটিমের অধিকার নয় বরং যিনি অভিযুক্ত তার অধিকার ও যুক্তির ওপর বিচারসংস্কৃতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। এই বাস্তবতায় বিচারসংস্কৃতির ভাষায় ধর্ষণ হয়েছে কি হয় নি– এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা গুরুতরভাবে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এবং ঘটনার সুনিপুণ/বিশদ বিবরণ ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতাকে বৈধতা দেওয়ার কৌশল হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে, বৈধতা প্রদানকে সম্ভব করে তোলে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বলছিলেন, *সাক্ষী হয়ত বলছেন তিনি ধর্ষিতা, খারাপ ঘটনাটি ঘটেছে। কিন্তু আমাকে রায় লেখার আগে তো জানতে হবে যে কী ঘটনার সাপেক্ষে সাক্ষী বলছেন ধর্ষণ ঘটেছে। বিশদভাবে ঘটনা বুঝতে হবে, সত্য-মিথ্যা পর্যালোচনা করতে হবে।*

---

[১১] দায়েরকৃত এবং একই সাথে খারিজকৃত ৩টি মামলার সাক্ষীরা এই ধরনের বক্তব্য আদালতে দিয়েছেন। সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা বিলোপের সুপারিশ প্রসঙ্গে অধিপরামর্শক গবেষণা কাজ করতে গিয়ে ৩০০ মামলার দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনা করা হয়। সেখান থেকে এই হেরে যাওয়া, খারিজ হয়ে যাওয়া মামলাগুলোকে তথ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (শুভ্রা, ২০১৬ অপ্রকাশিত)।

জুডিশিয়াল ডিসকোর্সে নারীর নিপীড়ন অভিজ্ঞতা, বিশেষত ধর্ষণ অভিজ্ঞতা বলতে না পারা স্বয়ং পুরুষালি চর্চার ফলাফল। 'ব্যাগ ছিনিয়ে' নেওয়ার চাইতে যে কোনো ধরনের সহিংসতাকে নারী যে ইজ্জত চলে যায় বলে ভিন্ন বলে জ্ঞান করে সেটি তার 'শরীরি অপবিত্রতার বোধ'। নারী নিপীড়ন প্রসঙ্গটি 'শরীরি অপবিত্রতা'র একটি চক্রের মধ্যে বসবাস করে। ইজ্জত/সম্ভ্রম চলে যাওয়ার এই ভেতরকার সামাজিক মননগত সাংস্কৃতিক বোধ শিখে নেওয়াটা নারীত্বের এমন গভীরে শেকড় গেঁড়ে থাকে যে নিপীড়নের বীভৎসতা সম্পর্কে মুখ খোলাটাও নারীর জন্য ট্রমাটিক কিংবা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এই ভুগতে থাকার বোধ স্বয়ং পুরুষতান্ত্রিক নিশ্চুপকরণ প্রক্রিয়ার কৌশলের অংশ। নারী তার নিপীড়ন অভিজ্ঞতায় ধর্ষণের শারীরিক অভিজ্ঞতাকে খারিজ করবার মতো যথেষ্ট এজেন্সিসম্পন্ন (শুভ্রা, ২০০৮); যা তাকে সামাজিকভাবে হেয় করে রাখে, সেটি হলো ধর্ষণের সামাজিক বিন্যাস, সামাজিক ট্রমা (শুভ্রা, ২০০৯; ২০১০; ২০১৬)। এই অশুচি হয়ে ওঠার সামাজিক ট্রমা থেকে মুক্ত হতে পারাই পুরুষালি মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিনারী ডিসকোর্স রচনার ভিত তৈরি করে। বিচারসংস্কৃতিতে লড়তে হলে নারীকে এজেন্ট হিসেবে জুডিশিয়াল ডিসকোর্সে সবাক হতে হবে। নারীকে তার ধর্ষণ অভিজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে বিশদ করার জন্য মাথা উঁচু করে প্রমাণের তালিকাসমেত আদালতকক্ষে উপস্থিত হতে হবে– সম্ভবত 'ইজ্জত' হারানোর ভীতিহীন সেই সময়েই নারী, নিপীড়ক চেনা-অচেনা, দূরের-কাছের যেই হোক সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে।

নারীর সবাক নিপীড়ন ইতিহাসই তার সম্ভাব্য নিপীড়নহীন ইতিহাসের ভিত্তি গেঁথে যায়।

৭.

জুডিশিয়াল ডিসকোর্সের চেহারায় ভিকটিমের ট্রমা/ঘটনার আবেগজনিত পারফরমেন্স তার 'ভিকটিম হিসেবে' সামাজিক নির্মাণকে শক্তপোক্তভাবে আইনের পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে। 'জীবনের মতো আদালত তো রঙ্গমঞ্চই আসলে। আইনের ঘনঘটার মঞ্চে শুনানির সময় কক্ষে যারা দর্শক হিসেবে ভিকটিমকে দেখছেন তারা ভিকটিম হিসেবে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে কি না এটি আইনজীবী হিসেবে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে'– হাইকোর্টের আইনজীবী বলছিলেন এই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠাই ভিকটিমের ওপর আইনের বিশ্বাস স্থাপনের ভিত তৈরি করে দেয়। আমাদের সমাজে ভিকটিম কেমন হতে পারে এর যেমন এক ধরনের ইমেজ আছে, ধরাবাঁধা ইমেজ; ঠিক তেমনি 'সত্যিকার ধর্ষকের' এক ধরনের সারসত্তাবাদী ইমেজারি মাথার ভেতরে ক্রিয়াশীল থাকে। 'ভিকটিম/অভিযোগকারী, তার ট্রমার সত্যিকার আবেগী প্রকাশের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাকে আদালতকক্ষে পুনরায় ফিরিয়ে আনে, যদি তার ওই আবেগ সমাজ প্রতিষ্ঠিত নিপীড়কের প্রতিষ্ঠিত ইমেজের আচরণ ও চেহারার সাথে মিলে যায়, তবে ধর্ষণের অভিযোগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে'[২২] (Temkin and Krahé, 2008; Randall, 2010; Edwards et al., 2011; Ventura,

[২২] ২০০০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সাক্ষ্য আইন ব্যবহৃত ৩০০ মামলার দলিল দস্তাবেজ থেকে মাত্র একটি মামলার রায়ে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারাকে ব্যবহার করে ভিকটিমপক্ষীয় যুক্তি শক্তভাবে দাঁড় করানো হয়। ২০০৫ সালে আমিনুর রহমানের পুত্র আফসার আলী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ৩ জন ও সহায়তাকারী ৫ জনসহ মোট ৮ জন অভিযুক্ত বাড়ির সদস্যদের জোরপূর্বক বাড়ির বাইরে এনে ধরে রেখে "অবিবাহিত কলেজ ছাত্রীকে" গণধর্ষণ করে। মামলার বিচারক রায়ে বলছেন, 'ভিকটিম একজন অবিবাহিত শিক্ষিত কলেজের ছাত্রী। রুচিশীল মর্যাদাবান মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। একজন অবিবাহিত শিক্ষিত মেয়ের কাছে তার সম্মান ও ইজ্জতই সবচাইতে মূল্যবান'। 'বিজ্ঞ উকিল সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে অভিযোগকারিণীর চরিত্র নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনেরই জায়গা নেই। অভিযুক্তদের এই ক্ষেত্রে কোনো ওজর করার সুযোগ নেই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের রুচিশীল সদস্য ও অভিযোগকারিণীকে বাধ্য

2017)। এই একই প্রক্রিয়ার উলটো দিক আছে, যখন কিনা অভিযুক্ত ব্যক্তি সামাজিকভাবে নামকরা-সফল হবেন, তখন ভিকটিম আক্রমণের সময় কীরকম আচরণ করেছিল কিংবা তাদের মধ্যে কী ঘটেছিল এগুলো তেমনভাবে আলোচিত হয় না (Ventura, 2017)। নিপীড়ক যদি সমাজের 'সত্যিকারের ধর্ষক' এই মিথের ধারণার মধ্যে না পড়েন, ধর্ষকের সারসত্তাবাদী ধ্যানধারণার সাথে ধর্ষকের আচরণ যদি না যায়, তবে অভিযুক্ত খুব সহজেই তার সাক্ষ্য, প্রমাণাদি, ঘটনার পরিক্রমা, অভিযোগকারীর সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি নানা কৌশলে নিজেকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে খালাস করে নিতে পারেন। বিশ্বজুড়ে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা বলছে, সফল শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আইনের ডিসকার্সিভ পরিসরে অদ্যাবধি নিজেদের ওপর বর্তানো দোষকে খারিজ করে দেয় ভিকটিম যৌন সম্পর্কে 'সম্মত' ছিল এই দাবি তুলে কিংবা তারা দাবি তোলেন, অভিযোগকারী/ভিকটিমের অসম্মতিকে/না চাওয়াকে তারা 'বুঝতে' পারেন নি (এই বুঝতে না পারার কারণ হিসেবে ভিকটিমের সাথে অভিযুক্তের বিগত সম্পর্কের বরাত টানেন এবং তার সফল সামাজিক অবস্থানকে ইঙ্গিত করেন) (Gotell, 2009; West, 2010; Cowan, 2007)। এই সূত্রে বাংলাদেশের ধর্ষণ মামলার গুরুত্বপূর্ণ মিল ও সাদৃশ্যের জায়গা হলো, প্রায় ৯০ ভাগ নিপীড়ন মামলায় অভিযুক্তপক্ষ স্বীকার করেই নেয় যে যৌনসঙ্গম হয়েছে। তাদের বাহাস কিংবা প্রমাণের জায়গা থাকে নারীটি (যে বয়সেরই হোক) সম্মতিতে যৌনকাজ করেছে কিংবা বাদীপক্ষের ভিকটিম আসলে *বেশ্যা*– বেশ্যার ধর্ষণ হয় না (শুভ্রা ২০১৩; ২০১৬)।

আইনকে যেমন আমরা নিরপেক্ষ, যৌক্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ হিসেবে দেখি– আইন তার চাইতে বহুদূরের বিষয়। আইনকানুন বস্তুনিষ্ঠতার বিপরীতে প্রায়শই ব্যক্তিনিষ্ঠতা এবং যুক্তিহীনতার প্রদর্শন ঘটিয়ে থাকে। আইনের অস্বচ্ছতা, অস্পষ্ট প্রয়োগ, আংশিকতার সাথে অতি অবশ্যই যার সাথে এই আইন কার্যকর হতে যাচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে (Smart, 1989)। বিচারকদের ক্রিমিন্যাল বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ধাপগুলো সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রদান করা হয়; কিন্তু ভিকটিমোলোজি, সাইকোপ্যাথোলজি ও জেন্ডার ইস্যুজ কিংবা সাইকোলজির মতো জ্ঞানের প্রথাগত শিক্ষার ঘাটতি দেখা যায় (Ventura, 2017)। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এই প্রসঙ্গে বলছিলেন, শিক্ষকদের যেমন ক্লাসে কীভাবে পড়াবে এর কোনো ট্রেনিং নেই, তেমনি বিচারক বিচারকার্য কীভাবে করবে তার কিন্তু কোনো শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দিয়ে দেয় না, এমনকি প্রশিক্ষণও না। আস্তে আস্তে নিম্ন আদালত থেকে ওকালতি করতে করতে কোনো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে থাকতে থাকতে শেখা। সেটি আইনের মারপ্যাঁচ। কিন্তু বিচার করবার বিষয়টি অভিজ্ঞতার সাথে সাথে জটিলতর হয়। বাস্তবতা এমন শুনাচ্ছিল যে বিচারের দক্ষতা অনেকটা ভেতরের জ্ঞানার্জনের মতো, যেটি আপনি বিচারক হিসেবে সময়ের সাথে সাথে, অভিজ্ঞতার সাথে সাথে অর্জন করবেন (Ventura, 2017)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক হিসেবে আমি যখন প্রশ্ন করলাম তাহলে বিচারক কীভাবে বুঝতে পারেন কোন অভিযোগ 'বিশ্বাসযোগ্য', কোনটি নয়? 'কিংবা কোন ভিকটিম মিথ্যা বলছে? সত্যিকারের রেইপ ভিকটিমই বা কেমন হয়? তার আচরণই বা কেমন হয়?' (Temkin and Krahé, 2008) মোদ্দাকথা, ধর্ষণকে বিচার করবার ক্ষেত্রে বিচারক তাহলে তার ব্যক্তিনিষ্ঠতার মাপকাঠিটা কোথা থেকে পায়? উত্তরে বিচারক বলছিলেন, *অতি অবশ্যই আমার* (বিচারকের) *অভিজ্ঞতা থেকে। ব্যক্তিগত বোঝাপড়া– জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে। আজকে প্রায় ৩০ বছর ধরে আমি যে আইনের পথে কাজ করছি সে অভিজ্ঞতার জোরে!*

হয়েই আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে এবং তারা আদালতে হলপ করে সাক্ষ্য দিয়েছে'। মামলার রায়ে অভিযুক্ত ৫ জন দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং বাদ বাকি ৩ জন প্রমাণের অভাবে অব্যাহতি পায় (শুভ্রা, ২০১৬)।

এই গবেষণায় ধর্ষণ মামলার সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রসঙ্গে সামাজিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিচারকের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে ভিকটিম, যিনি ট্রায়ালে থাকবার কথা না, তিনি থাকেন। তিনি অভিযোগ প্রমাণ করেন, তার সাথে জড়িত থাকে একাধিক প্রত্যয়; যেমন সম্মতি, অসম্মতি, চরিত্র/দুশ্চরিত্র, হাইমেন– পুরোনো ছেঁড়া/নতুন, যৌনকাজে অভ্যস্ত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইত্যাদি বিশেষণগুলো সামাজিক ভাবনা থেকে উৎসারিত হয়। আর সেই ভাবনার কাঠামো থেকে আমরা আদালত ও আদালতের বিচারকদের যতই দেওয়াল দিয়ে আড়াল করে রাখি বলে সামাজিকভাবে চিত্রিত করি না কেন, বিচার প্রক্রিয়া স্বয়ং একটি 'non-formal and non-technical tools' (Burt, 1980; Du Mont et al., 2003; Bohner et al., 2009; Ventura, 2017)-এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়; এই অপ্রাতিষ্ঠানিক, এবং অকৌসুলি প্রক্রিয়ায় ভর করেই বিচারক তার পেশাজীবী মনোভাবের ভিত্তিতে নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার করেন। আর এই কারণেই বিচারের রায় মাত্র প্রশ্নাতীত থাকতে পারে না[১৩] (শুভ্রা, ২০১৬)।

৮.

পুরুষালী সমাজে মূলত নারী বিদ্বেষী পরিপ্রেক্ষিতে নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশেষত ধর্ষণ এর মতো সংবেদনশীল নিপীড়ন নিয়ে মামলা যেহেতু চলমান আছে তখন আশাবাদের কথা হচ্ছে নারী এজেন্সী দল হিসেবে একেবারে নাই হয়ে যায়নি। গবেষণা করতে গিয়ে আমাকে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। একাধিক ভিকটিম নারী, যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন ধর্ষণ করা সমাজে খারাপ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। *যদি খারাপ কাজই হয়, তবে আদালতে ধর্ষকের সাথে এতো মানুষ থাকে, আমার সাথে কেউ নাই কেন? আমাকে একলা এইখানে আশ্রয়কেন্দ্রে ফেলে রেখে গেছে কেন? নিবে না তো*! বিগত এক যুগ ধরে আমি এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে খোঁজার চেষ্টা করেছি, অদ্যাবধি করছি। একাধিক ধর্ষণ মামলার শুনানি দেখতে গিয়ে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে গবেষক হিসেবে আমি দেখেছি ধর্ষকের সাথে তার পরিবার, বন্ধু বান্ধব, একাধিক উকিল, পাড়ার মাতব্বর শ্রেণীর মানুষজন, দুরবর্তী প্রভাবশালী একাধিক সদস্য কোর্টে আদালতের শুনানির সময় উপস্থিত থাকে।

---

[১৩] ধর্ষণ মামলার বিচারের রায় যে পুরুষালি ভাবনাকে বহন করে, সেটি আমার একাধিক লেখায় দেখতে পাবেন। ২০১৬ সালে ব্লাস্টের সাথে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা বাতিলকরণের জন্য যে গবেষণা কাজটি সম্পাদন করা হয়, তার জন্য ব্যবহৃত মামলার একাধিক রায়ের একটি উদাহরণে মহামান্য বিচারক বলছেন : চরভদ্রাসনের ১৩ বছর বয়সের মেয়েশিশু গণধর্ষণের শিকার হয়ে অপহরণের ১ মাস পর বাড়ির কাছের পাটক্ষেত থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। তার পিতা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(৩) ধারা মোতাবেক অপহরণ ও গণধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। ঘটনার ৪০ দিন পর মেডিকেল সনদে চিকিৎসক কিছু তথ্য হাজির করেন, যার মধ্যে আছে 'ভিকটিমের স্তন্য পুরোদস্তুর উন্নীত ও ঝুলে পড়া, যৌনকেশ বাড়ন্ত, হাইমেন পুরানো ছেঁড়া'। সনদ এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, ভিকটিমের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর, তার শরীরে কোনো জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমের চিহ্ন নেই কিন্তু ভিকটিম যৌনসঙ্গমে পূর্ব থেকে অভ্যস্ত। এই সনদের হাত ধরে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত ৭ জনের মধ্যে ৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে যায়, চার্জশিটে তাদের নাম ওঠে নি। বাকি ২ অভিযুক্তের একজনের সাথে নারীটির পূর্বপরিচয় থাকবার কারণে আদালত পুনর্বার তদন্ত কর্মকর্তাকে তিনটি সূত্রে তদন্ত চালানোর নির্দেশ জারি করেন : '১. প্রত্যক্ষ, নিরপেক্ষ ও স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে, ২. ভিকটিমের ভালোবাসার সূত্রগুলি ভালোভাবে দেখিতে হইবে এবং ৩. তদন্তপূর্বক আসামিকে গ্রেফতার করিতে হইবে'। এই তদন্তের প্রেক্ষিতে মেডিকেল সনদের যৌন সম্পর্কে অভ্যস্ততা ও জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমের কোনো লক্ষণ না থাকার প্রমাণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির সাথে অভিযোগকারীর ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারার মধ্য দিয়ে কোর্ট গণধর্ষণের মামলা খারিজ করে দেয়। চার্জশিটে নাম ওঠা ২ জন অভিযুক্তের একজন সাক্ষ্য আইনের মাধ্যমে ভালোবাসার সম্পর্ক এবং নারীটির সাথে তার অপর বন্ধুর শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং ধর্ষণের অভিযোগ আনয়নকারী নারীটি 'খারাপ চরিত্রের' প্রমাণের মধ্যে দিয়ে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা থেকে খালাস পেয়ে যান।

অন্যপক্ষে, যিনি কিনা ভিকটিম তার তরফ থেকে মূলত পাবলিক প্রসিকিউটর, ভিকটিম নিম্নবিত্ত এবং খুব কম বয়স হয়ে থাকলে (সর্বোচ্চ ১০ বছর) অনেক সময় তার নিজের মা/অভিভাবক শ্রেণির কোনো নারী সদস্যকে দেখা যায়, পরিবারের সদস্য কেউ থেকে থাকলে সচরাচর তা হয়ে থাকেন *ভিকটিমের* দাদা/নানা কিংবা এরকম শ্রেণির কেউ যিনি অত্যন্ত বয়স্ক, পরিবারের বাইরে যে এনজিও ভিকটিমকে সাহায্য করছে তাদের আইনজীবী এবং আশ্রয়কেন্দ্রের স্টাফই থাকেন। ভীষণরকম অসহযোহিতামূলক একটি আবেগীয় পরিস্থিতি তৈরি হয় (শুভ্রা, ২০০৮; ২০১৩; ২০১৬)। এই প্রসঙ্গে ভিকি আন্দোলনের একজন সাক্ষী বলছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমার মাকে সাথে নিবো। পরে ভাবলাম আমি সাক্ষী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার মা তো এইরকম সিদ্ধান্ত নেয় নি। উনাকে মিডিয়াতে, বিপদের মধ্যে ফেলবার ইচ্ছে হলো না। নারীমাত্রই নিপীড়ন নিয়ে কথা বলতে গেলে একটা ঝামেলার শুরু হয়। ঝামেলাটা শুধু ওই ভিকটিম নারীর একলার থাকে না। ঢিল ছুড়লে নদীতে যেমন ছড়িয়ে যায় তেমন ছড়িয়ে পড়ে...'।

ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে ভিকটিম/সার্ভাইভারের তরফ থেকে সাক্ষী থাকতে পারে আবার বিবাদী কিংবা অভিযুক্তের পক্ষ থেকেও সাক্ষী থাকতে পারে। সাক্ষীদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ধর্ষকের মতো করে ধর্ষকপক্ষীয় সাক্ষী সামাজিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে থাকেন ধর্ষণ মামলা 'মিথ্যা' (তার পরিচিত অভিযুক্ত এই ধরনের কাজ করতে পারে না/*মেয়ে খারাপ*) এবং মামলা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে 'অভিযুক্তের' সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা পুনরায় ফিরে আসবে এবং বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক সম্মান পুনরায় ফিরিয়ে আনা যাবে। ফলে আসামিপক্ষের সাক্ষী আসামির পক্ষে এবং ভিকটিমের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় একটি সামাজিক দায় ও প্রণোদনা অনুভব করেন। 'বাড়ির ছেলে উদ্ধারের' মতো মহৎ কাজ করছেন, যেখানে ছেলেরা এক আধটু ভুল করেই থাকে। এই একই সামাজিক বিন্যাসের অপরপিঠ হলো– ধর্ষণের যিনি কিনা ভিকটিম/সার্ভাইভার অথবা ধর্ষণের পর যিনি মারা গেছেন এমনকি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তাকেও সমাজ কাঙ্ক্ষিত কোনো মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে না। মনে করা হয় তিনি 'অপবিত্র' শরীর ধারণ করছেন। যিনি ধর্ষণ প্রমাণ করতে পেরেছেন, তিনি তো সামাজিকভাবে 'ধর্ষিতার' লেবেল শরীরে এঁটেসেঁটে নিয়ে সমাজের বাইরে 'মুখে চুনকালি মাখালেন'। ফলে ধর্ষণের ঘটনার পক্ষে, বাদীর পক্ষে দাঁড়িয়ে ধর্ষণকে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী সামাজিকভাবে কোনো ইতিবাচক চৈতন্য অনুভব করে না। বরং পুরুষালি চর্চা নারীর উপর আসা সহিংসতা, বিশেষত ধর্ষণকে– এমনকি ধর্ষণের ফলে জন্ম হওয়া বাচ্চাসমেত নিপীড়নকে অস্বীকার করাটাকেই অত্যন্ত কাজের কাজ বলে মনে করে। এমনকি এটা ঘটে ভিকটিম/নিপীড়িত/সার্ভাইভারের পরিচিত/পরিবার কিংবা কাছের মানুষরা যদি জেনেও থাকে যে ধর্ষণ আদতে ঘটেছে।

এই বাস্তবতার ইতিহাসের গোড়া ১৯৭১-এর বীরাঙ্গনাকে 'বীরাঙ্গনা' না বলে 'মুক্তিযোদ্ধা' সম্বোধনের মধ্যে পাওয়া যায়, পুনর্বাসনের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন ধর্ষণকে রাজনৈতিক নির্যাতন হিসেবে দেখা, মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখবার সাথে সাথে ৭১-এর ২ লক্ষ নারীর ধর্ষণের বাস্তবতাতেই প্রথমবারের মতো গর্ভপাতের বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ঠেকাতে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশই বিশ্বে একমাত্র রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে স্বাধীনতার পর প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাড়ির ঠিকানাকে 'বীরাঙ্গনা' নারীর ঠিকানা বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে যে নারীরা ধর্ষণ ও নিপীড়নের সার্ভাইভার ছিলেন তাদের সমাজে ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় (ব্রাউনমিলার, ১৯৭৫)। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নারী নিপীড়নের অভিজ্ঞতার 'হার-স্টোরির হাওয়া হয়ে যাওয়া, নারী এ্যাক্টরের পতন আর ভিক্টিম দশায়

বিস্মরণে চলে যাওয়াতেই' (খাতুন, ২০১৫) 'বীরাঙ্গনা' কোটায় কোনো নাগরিক সুবিধা অর্জিত হয় না। এই বিস্মৃতির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অপরাপর ফৌজদারি মামলা, যেমন খুনের আসামির পক্ষে সাক্ষী পাওয়া যতটা কঠিন, ধর্ষকের পক্ষে আর ধর্ষিতার বিপক্ষে সাক্ষী পাওয়া সামাজিকভাবে ততটাই সহজ হয়ে ওঠে।

৯.

অপরাপর নিপীড়নের সাথে নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশেষত ধর্ষণ মামলার পার্থক্য হচ্ছে জুডিশিয়াল ডিসকোর্স এতে এক ধরনের 'ট্রমা শো' (Burt, 1980; Du Mont et al., 2003; Bohner et al., 2009) দেখতে আগ্রহী থাকে। আর এই ট্রমা শো কিংবা বিদীর্ণ যন্ত্রণার আদালত-মঞ্চায়নে সামাজিক যতরকমের সারসত্তাবাদী লিঙ্গীয় ধ্যানধারণা, লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনমূলক ভূমিকা ও ইমেজ রয়েছে, ভিকটিম হিসেবে আপনার পক্ষে সুবিচার অর্জন করতে গেলে আপনাকে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যেমন ধরেন বড় বড় নায়িকা কিংবা প্রতাপশালী নারীদেরও আমরা দেখি আইনের লড়াই লড়তে গেলে ঘোমটা দিয়ে যেতে, যে পোশাক উনারা সাধারণত পরেন না। অথবা পিতা হয়ত নিয়মিতই মদ্যপান করেন সেটি বিবেচ্য নয়, মা যদি কোনো এক অনুষ্ঠানে এক আধ পেগ মদ খেয়েও থাকেন আর তার ফটোগ্রাফ থেকে থাকে তবে ডিভোর্সের মামলায় ওই ফটোগ্রাফ সন্তানের কাস্টডি না পাওয়ার জন্য ভয়াবহ হুমকি হতে পারে– এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ বাংলাদেশের মামলার দস্তাবেজে পাওয়া যায়। 'সত্যিকারের ধর্ষণের" মিথ অনুযায়ী শরীরি ভাষায়, আবেগে যদি চরম যন্ত্রণা আদালতকক্ষে ফুটিয়ে তোলা না যায়, তবে সাক্ষীর সাক্ষ্য ভিকটিমের পক্ষে তেমন কোনো মূল্য বহন নাও করতে পারে (Burt, 1980)। গুরুত্বপূর্ণ হলো, মধ্যযুগ থেকেই এই চর্চা চলমান এবং ধর্ষণের চালচিত্র/রেকর্ড আদতে নারীত্ব/সামাজিক নারীত্বকে প্রতীকীকৃত করে কিংবা উপস্থিত করে। সত্যিকারের ধর্ষিতা কেমন হবে, এই বৈশিষ্ট্য আসলে কাঙ্ক্ষিত নারীর চেহারাই সমাজের সামনে বারবার হাজির করতে থাকে (Smart, 1989; Marcus, 1992)।

সাক্ষী, তিনি স্বয়ং ভিকটিমের শরীরে সাক্ষ্য হিসেবে বিরাজমান থাকুক; সাক্ষী তিনি ভিকটিম নিজে হয়ে থাকুন, ভিকটিমপক্ষীয় সাক্ষীর এক ধরনের নারীবিদ্বেষী 'অশুচি' হয়ে ওঠার বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই সামাজিক একঘরেকরণ ভিকটিমের শ্রেণি, লিঙ্গ, পরিসর, সামাজিক মর্যাদা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু নোংরা, অশুচি হয়ে ওঠার বোধটা ভিকি মামলার সাক্ষীর মতো নদীর পানিতে ঢিল ছুড়লে যেমন ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ধর্ষিতার সাথে যারা যারাই যুক্ত থাকেন তারা তারাই কোনো না কোনোভাবে বিদ্বেষী সামাজিক বাস্তবতার সম্মুখীন হোন। যে বাস্তবতা নারীকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে দোষারোপ করাটাকেই উত্তমতর মনে করে, সামাজিক চৈতন্য সামাজিক আইনের শাসন বিনষ্ট করবার জন্য 'আদমের আপেল খাওয়ার পেছনে ঈভের যেমন হাত আছে'/স্বর্গ থেকে নারীর জন্য পতন– ওই বোধ থেকে বোধ করতে শেখায় নারী নিপীড়নের মূল হোতা নারীই– পুরুষ কেবল তার শারীরিক মরিয়াত্বের কারণে ভুল করে কাজটা করে ফেলে। ঘটনার ধামাচাপাটাই তাই সামাজিকভাবে কাম্য। এই ধামাচাপার আগ্রহটা কেবল ধর্ষক প্রসঙ্গে হয় এমন না, ধর্ষক ও ধর্ষণসংশ্লিষ্ট যে কারো প্রসঙ্গে হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিকভাবে যার প্রসঙ্গে ধামাচাপা দেওয়ার সামাজিক চেষ্টা চলছে তিনি সামাজিকভাবে কতটা সফল ও শক্তিশালী। এই প্রেক্ষিতে ভিকির মামলার বাদী, সার্ভাইভারের দাদা (যিনি মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী) তিনি জানান, 'তাকে মামলার পর থেকে নানা সময়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে। কখনো রাস্তাঘাটে দেখা করে, মোবাইলে ফোন করে। যারা দেখা করেন বা কথা বলেন তারা সকলে লিঙ্গীয় পরিচয়ে পুরুষ। ভিকারুন্নেসা স্কুলের অভিভাবক হিসেবে পরিচয় দিয়ে কেউ ধর্ষক পরিমল নির্দোষ এই প্রসঙ্গে কথা বলেন না। তাদের বক্তব্য হলো ভিকির ধর্ষণ মামলায় অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম এবং শাখাপ্রধান লুৎফর

রহমান যা করতে পারতেন করেছেন। তারা নির্দোষ। এই হুমকিগুলো মূলত অধ্যক্ষ প্রসঙ্গে, তাঁর তরফদারি করে প্রদান করা হয়। হুমকিদাতারা বলেন, *অধ্যক্ষ ঘুরিয়েছে, ধামাচাপা দিতে চেয়েছে এসব বললে, কথাবার্তা চললে ভালো হবে না। এসব করলে ভিকির দাদা ও তার পরিবারের ভালো হবে না। লাশ পড়ে যাবে*[১৪]।

জুডিশিয়াল ডিসকোর্সে আমাদের সত্য জানাতে হবে, সেটি আবার হতে হবে 'বস্তুনিষ্ঠ'; তাই ব্যক্তিক আইনজীবীকেই আমাদের সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিগত যন্ত্রণার যাবতীয় অভিজ্ঞতাগুলো বয়ান করে যেতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ পুরুষালি পুঁজিবাদী ফাঁদ হলো নারী হিসেবে, কিংবা যে কোনো লিঙ্গীয় আত্মপরিচয়ের মানুষ হিসেবে বড় হতে গিয়ে আপনি সমাজ থেকে নিপীড়ন তথা ধর্ষণ অভিজ্ঞতাকে 'নেতিবাচক' হিসেবে জানেন-শেখেন-বোঝেন। আপনাকে সমাজ শরীরি যৌনতার শুচিতা থেকে মুক্তি দেবে না (শুভ্রা, ২০০৮) কিন্তু প্রতিষ্ঠান চাইবে আপনি সবাক হোন, গলা চড়িয়ে নিজের নিপীড়ন অভিজ্ঞতার কথা বলুন এমন কিছু নিয়ে যে প্রসঙ্গকে আপনি 'খারাপ' কিংবা নিজের দোষ বলে সামাজিকভাবে বিশ্বাস করেন কিংবা সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বাস করবার চৈতন্যে প্রশিক্ষিত হয়ে এসেছেন। কেবল আপনি বিশ্বাস করেন তাই নয়, যাকে বলবেন, যে আইনজীবী, বিচারালয়, বিচারসংস্কৃতিতে বলবেন তারা স্বয়ং মনে করে 'বড় গলার মেয়েদের সাথে খারাপই হয়'। আর এই কারণেই যে নারী সক্রিয় নারীবাদী হিসেবে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে মাঠেঘাটে নারীর নিপীড়ন নিয়ে কাজ করছেন, মামলা মোকদ্দমায় ভিকটিম/সার্ভাইভারদের পাশে থাকছেন, পতিতালয় উচ্ছেদের ঘটনায় পতিতাদের পক্ষে যিনি লড়াই করেছেন/করছেন; প্রশাসন-পুলিশ-বিচারালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন, নারীবিদ্বেষী সামষ্টিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাজ করছেন; সামষ্টিক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তার ব্যক্তি জীবনে ঘটে যাওয়া আকস্মিক দুর্ঘটনায় একটা সময় তিনি মনে করতে শুরু করেন, নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার চাইবার জন্যই তার কাছের মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং এই বোধ তার সমাজ থেকেই প্রাপ্ত। তিনি বলেন, *আমার সন্তানের এমন দুর্দশার পর আমি প্রায়ই ভাবি আমার জন্য এই যে কত ধর্ষকের শাস্তি হয়েছে, সব মেয়েই কি সত্য কথা বলেছে? ধর্ষকরা কি আসলে সবাই মিথ্যা বলেছে? কোনো মেয়েরই কি কোনো আনন্দ হয় নাই? নিশ (নিঃশ্বাস) লাগল বলেই কি আমার সন্তান আমার কোল ছাড়া হয়েছে?* ধর্ষণ নিয়ে গবেষণা কাজ করতে গিয়ে গবেষক হিসেবে আমার নিজেকে ক্রমাগত অসহায় লাগতে থাকে। আমার মনে হয় আমি ক্রমাগত একটি চক্রাকার ব্যূহের মধ্যে পতিত হয়ে যাচ্ছি। এই আফসোস ও বিশ্বাসহীনতা আমাকে একসারি ধর্ষকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। অভিযুক্ত এবং আসামি, জেলখানার পুরুষরা আমাকে বলছিলেন, *আমরা তো জেলেই আছি, কিন্তু ধর্ষণের সময় কি ওই মাগীরা একটুও মজা পায় নি*। আমার নারীসত্তা ভয়ে কেঁপে উঠেছে– এই সামাজিক সংযোগে। এই সংযোগ ধরতেই ফিরে যাই এই প্রবন্ধের শুরুতে থাকা সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুরের 'গায়েবী ধর্ষণ মামলার হয়রানি' শিরোনামের সংবাদে।

ধর্ষণ আইনি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এর সাথে 'পুরুষালি ক্ষমতা প্রয়োগ' ও 'পুরুষালি রাজনীতি'র সম্পর্ক আছে। এই আইন ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে বস্তুনিষ্ঠতার মোড়কে হাজির করে এবং প্রশ্নাতীত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে এবং শেখায়। আইনের সামাজিক বোঝাপড়ায় সামাজিক সমুদয় বোঝাপড়াটাই বিরাজমান– ফলে ধর্ষণ যতটা না নারীর প্রতি সহিংসতা, যতটা নারীর শরীরের প্রতি সহিংসতা, যতটা না নারীর প্রতি কৃত অপরাধ, তার চাইতে বেশি ধর্ষণকে আইনি ডিসকোর্স নৈতিকতা, পবিত্রতা, সম্মান, সম্ভ্রম, সতীত্বের অবকাঠামোর মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় (শুভ্রা ২০১৩; ২০১৬)।

[১৪] ভিকির মামলার বাদী ভিকটিমের দাদা গত ১১.০৮.২০১১ তারিখে বাড্ডা থানায় ৭২৫ নং স্মারকে ১১.০৮.২০১১-এ একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।

পুরো প্রক্রিয়ায় আদতে ধর্ষণের মামলাগুলোয় ধর্ষিতা কিংবা ভিকটিম অথবা সার্ভাইভারের আবেগ, তার অনুভূতি, তার শরীরি সাক্ষ্য, তার পক্ষীয় সাক্ষী কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই যাবতীয় সাক্ষ্য ধর্ষণ মামলার ফরেনসিক ফরমেট, সাক্ষীর ফরমেট, আইনজীবীর ফরমেট ও বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যিকারের ধর্ষণ মিথকে সন্তুষ্ট না করবে। মনে রাখা জরুরি, এই সমস্ত ফরমেটের ভিত যে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সেসবই সমাজ ও সংস্কৃতিনির্ভর– ব্যক্তিনিষ্ঠ। প্রশ্নাতীতভাবে জ্ঞানক্ষমতার যুগে এই বিশেষজ্ঞ জ্ঞানমাত্রই বস্তুনিষ্ঠতার মোড়কে ব্যক্তিনিষ্ঠ শাসনের ক্ষমতার অধিকারী!

প্রবন্ধ শেষ করতে চাই আশাবাদের কথা বলে। যে নারী ধর্ষণের চেষ্টা আর দাহ্য পদার্থ দিয়ে শরীর ঝলসে যাওয়ার পরেও 'সহজলভ্য' খেতাবসমেত মামলায় হেরেছেন তিনি বর্তমানে নতুন সংসার করছেন, এক সন্তানের মা হয়েছেন। নিজের সংসার, শরীর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন, *আমি তো সংসারে সৎ থাকতে চায়ে বাটপার হইছি। এখন সেই বাটপাররে বিয়ে করছে, মিথ্যুকরে বিয়ে করছে ধইরা নেন। আমি তো নেংটা, নেংটার আবার ভয় কিসের আপা*! এটাই আশার কথা। রাষ্ট্র তো দরকষাকষি সমঝোতা ও নানাবিধ বাতচিতের পরিসর। ভিকির সেই আন্দোলনকর্মীর কথার রেশ আবার টানতে চাই। তিনি বলছিলেন, নদীর ভেতর ঢিল ছুড়লে কোথায় ঢিল পড়বে খুঁজে পাবেন না, ঢিল ছুড়তে হবে বড় কিংবা আপনাকে হতে হবে নদীই। ধর্ষণ নিয়ে আন্দোলন আমাদের এভাবে করতে হবে। অমন বিশাল!

আইনি ডিসকার্সিভ লড়াইয়ে সমুদ্রের গর্জন হোক ভিকটিম/সার্ভাইভার নারীর সাক্ষ্য এবং তাদের সমুদয় সাক্ষী! নেংটার আদতেই বাটপাড়ের ভয় থাকে না!

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা, সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। fatama.suvra@gmail.com

তথ্যসূত্র

Adler, Z., 1987, Rape on Trial, London: Routledge & Kegan Paul.

Berger, V., 1977, Man's Trial, Woman's Tribulation: Rape Cases in the Courtroom, Columbia Law Review, 77: 1, pp. 1–103.

Bourke, J., 2007, Rape: A History from 1860 to the Present, Virago: London.

Brownmiller, Susan, 1975, Against Our Will: Men, Women and Rape, Simon and Schuster, New York.

Burt M, 1980, Cultural Myths and Supports for Rape. Journal of Personality and Social Psychology, Vol: 38 (2): 217–230.

Edwards, K., Turchik, J., Dardis, C., Reynolds, N. and Gidyez, C., 2011, Rape myths: History, individual and institutional-level presence, and implications for change, Sex Roles, Vol. 65 (11): 761–773.

Foucault, Michel, 1984, *The History of Sexuality*, Pantheon Books, NewY ork.

Gavey, N., 2005, Just sex? The cultural scaffolding of rape, New York, Routledge.

Guharhakurta, M., 1985, *Gender, Violence in Bangladesh: The Role of the State*, In The Journal of Social Studies, SonyK publication, Dhaka.

Haraway, D., 1991, *A cyborg manifesto: science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century*, In: *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, Routledge: New York.

Kannabiran, Kalpana, 1996, *Rape and the Construction of Communal Identity*, In Jayawardena, K., and De Alwis, M., (Ed), *Embodied Violence, Communalising Women's Sexuality in South Asia*, India, Kali for Women.

Lees, S., 1997, *Ruling Passions: Sexual Violence, Reputation and the Law*, Open University Press: Buckingman, UK.

Marcus, S., 1992, *Fighting bodies, fighting words: A theory and politics of rape prevention*, In Butler J and Scott J., (eds), *Feminists theorize the political*. Routledge: New York,

Matoesian, G. M., 1993, *Reproducing Rape: Domination through Talk in the Courtroom*, Cambridge: Polity.

McMillan L., and White D., 2015, *'Silly girls' and 'nice young lads'*, *vilification and vindication in the perceptions of medico-legal practitioners in rape cases*. Feminist Criminology, 10 (3): 279–298.

Mookherjee, Nayanika, 2002, *A Lot of History: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh Liberation War of 1971*, D. Phil thesis in Social Anthropology, SOAS, University of London, London.

Moran-Ellis, Jo, 1996 (1997), *Close to home: the experience of researching child sexual abuse*, In Radford, J., Kelly, L., and Hester, M., (eds), *Women, violence and male power*, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.

Naffine, N., 1992, *Windows on the Legal Mind: the Evocation of Rape in Legal Writing*, Melbourne University Law Review, 18: pp. 741–67.

Panna, Shah Afroditi and Faustina Pereira. "Rights of Women." *Human Rights in Bangladesh 2008*. Ed. Sara Hossain. Dhaka: Ain O Salish Kendra, 2009, p. 167. Website link: http://www.askbd.org/web/?page_id=430>

Portelli, Alessandro, 1992, *What makes oral history Different*, Perks, Robert, and Thomson, Alistair eds, *The Oral History Reader*, Routledge, London.

Portelli, Alessandro, 1991, *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*, State University of New York Press.

Radford, J., Kelly, L., and Hester, M., (eds), *Women, violence and male power*, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.

Rougerie, Sylvie McCallum, 2011, The Practical Challenges Related to the Collection and Use of Medical Evidence in Rape Trials in Bangladesh, BLAST.

Samuel, Raphael, 1983, *Perils of the transcript*, in Perils, Robert, and Thompson, Eliaster, ed, *The Oral History Reader*, Westport, Greenwood Publishing Group.

Schrager, Samuel, 1983, *What is social in oral history?* In Perils, Robert, and Thompson, Eliaster, ed, *The Oral History Reader*, Westport, Greenwood Publishing Group.

Scully, D. (1990) *Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists,* London: Unwin Hyman.

Simon & Schuster, Chambers, G. and Millar, A., 1987, Proving Sexual Assault: Prosecuting the Offender or Persecuting the Victim? P. Carlen and A. Worrall, (eds), Gender, Crime and Justice, Milton Keynes: Open University Press.

Smart, C., 1989, *Feminism and the power of law,* Routledge: New York.

Suvra, Fatama, 2013, *Contested Dissent: Social Crisis Related to the Collection and Use of Medical Evidence in Rape Trials, in Ideas and Practices in Developement: Anthropologial perspective, Department of Anthropology, Rajshahi University, Rajshahi.*

Stanley, L, 1992, *The Auto/Biographical I: Theory and Practice of Feminist Auto/ Biography, <amchester: Manchester University Press.*

Temkin, J. 1987, *Rape and the Legal Process,* London: Sweet and Maxwell.

Temkin, J. 1996, *Doctors, Rape and Criminal Justice,* Howard Journal of Criminal Justice: 35.

Walby, S, 1994, *Towards a Theory of Patriarchy*, in *The Polity Reader in Gender Studies-I*, U.K., Polity press.

গুহঠাকুরতা, মেঘনা, ১৯৯৮, *সহিংসতা এবং নিপীড়ন : নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়া*, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৬৬, ঢাকা, সনিকে প্রকাশনা।

চক্রবর্তী, ভানু, ২০০৪, *পথে বিপথে : মেয়েদের নিরাপত্তা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এবং আলাপ।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৮, *অভিজ্ঞতায় ধর্ষণ : বহুমাত্রিক সহিংসতা ও নারী জীবনের পুনর্গঠন*, অপ্রকাশিত স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক গবেষণা থিসিস।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৯, *আমি কি নারীবাদী? নারীর প্রতি সহিংসতা গবেষণার অভিজ্ঞতা*, নারী ও প্রগতি, ষাণ্মাসিক জার্নাল, সংখ্যা ৮, বর্ষ ৪, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮ (পুনরায় প্রকাশিত জেন্ডার ও যোগাযোগ, প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ, জুন ২০১০, বাঙলায়ন প্রকাশনী)।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০১০, *ভীষণ চেনা : সহিংসতাবিদ্ধ নারী গবেষকের নারীর প্রতি সহিংসতা গবেষণা অভিজ্ঞতা*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ১১০, সেপ্টেম্বর ২০০৯, সনিকে প্রকাশনা।

শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০১৬, *"সতীরই" কেবল ধর্ষণ হয়": সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা*, ব্লাস্ট প্রকাশনী, ঢাকা।

সুলতানা, মির্জা তাসলিমা, এবং ইসলাম, সাদাফ নূর-এ, ২০১১, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা : নারীবাদী দর্শনের সাম্প্রতিক সংকট ও উত্তরণ ভাবনা, আহমেদ রেহনুমা, সম্পাদিত, পাবলিক নৃবিজ্ঞান: প্রবল ও প্রান্তিক ১, দৃক বুকস, ঢাকা।

খাতুন, সায়েমা, ২০১১, মুক্তিযুদ্ধের HIS-STORY: ইজ্জত ও লজ্জা, আহমেদ, রেহনুমা, সম্পাদিত, পাবলিক নৃবিজ্ঞান: প্রবল ও প্রান্তিক ২, সন্ধি প্রকাশনী, ঢাকা।